

নিষ্কৃতি

নাটক

বহু মূহলে অভিনীত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সর্বজন পরিচিত কাহিনী হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত

চতুর্থ সংস্করণ ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

এক টাকা আট আনা

শরৎচন্দ্রের-

সুযোগ্য বংশধর

শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনের

নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে 'নিষ্কৃতি' মঞ্চস্থ হয়েছে। রঙ-মহলের
 প্রীতিভাজন নট শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় এর
 মূলে যে আনুষ্ঠানিকতার পরিচয় দিয়েছেন—তা অবিস্মরণীয়। বঙ্গীয় প্রগতি
 চলচ্চিত্র নাট্যসঙ্ঘ ১৯৫১ সালের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-কৃতিত্ব বলে 'নিষ্কৃতি'কে
 অভিনন্দিত করেছেন। এ অভিনন্দনের মূলে স্বনামধন্য কীর্তিমান নট
 শ্রীজহর গাঙ্গুলী, বর্তমান বঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা এবং
 সর্বজনস্নেহধরা শ্রীমতী রাণীবালায় কৃতিত্ব সর্বাদিক। এই নাটকের
 সঙ্গে, এঁদের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। ইতি—

১৯ই জাম্বয়ারী

১৯৫২

}

নির্দীপ্ত

দেবনারায়ণ শুক্ল

প্রথম বক্তৃতা অধিবেশন ও অধিবেশীস্বন্দ

শুভ-উদ্বোধন ১৫ই আশ্বিন ১৩৫৮, ২রা অক্টোবর, মঙ্গলবার ইং ১৯৫১

গিরীশ	...	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
হরিশ	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
বেহারী	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
রমেশ	..	শ্রীঅবনী মজুমদার
হরলাল	...	শ্রীদেবেন ব্যানার্জি
গণেশ	...	শ্রীউমা দাস
মণীন্দ্র	...	শ্রীপুলিন মিত্র
হরিচরণ	...	মাঃ রূপকুমার পরে মাঃ লিটন
অতুল	...	মাঃ সুধেন দাস
কানাই	...	মাঃ চপল কুমার
বিপিনী	...	মাঃ সত্যব্রত
পটল	...	মাঃ সুব্রত
সিদ্ধেশ্বরী	...	শ্রীমতী প্রভা দেবী
নয়নতারা	...	সর্বজনস্নেহধারা রাণীবালা পরে শ্রীমতী অমলী রায়
শৈলজা	...	শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী
নীলা	...	শ্রীমতী শেফালী দত্ত পরে শ্রীমতী গীতা দেবী

সহাধিকারী	...	শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায়
কাহিনী	...	৩শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
স্বর-সৃষ্টি	...	শ্রীদুর্গা সেন
মঞ্চ-শিল্পী	...	শ্রীবৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যন্ত্রাসজ্জা	...	শ্রীস্ববোধ মল্লিক (ছিহু), শ্রীশর- দিন্দু ঘোষ, শ্রীকালীপদ সরকার, শ্রীবিষ্ণনাথ কুণ্ডু, শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শ্রীকানাই দাস, শ্রীবংশীধর রায় ।
স্মারক	...	শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীসত্য সরকার
লিপিকার	...	শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত
সজ্জাকর	...	শ্রীনুপেন রায়, শ্রীবিভূতি দাস, শ্রীপঞ্চানন গাংতরা, মহবুব্
আলোকশিল্পী	...	শ্রীশ্যামসুন্দর কর, শ্রীঅমিয়- কুমার দত্ত, শ্রীশক্তিপদ ঘোষ, শ্রীনন্দলাল দাস
দৃশ্য সংযোজনায়	...	শ্রীমণীন্দ্র দাস, শ্রীকালীপদ সোম, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীবাদল ঘোষ, শ্রীগৌরী কুমারী, শ্রীঅনাদি ঘোষ
আহাৰ্য সংগ্রাহক	...	শ্রীশঙ্কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ ব্যবস্থাপক	...	শ্রীদেবেন ব্যানার্জি
ঐ সহ	...	শ্রীনীরেন মিত্র
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়

পুরুষ

গিরীশ	...	খ্যাতনামা উকিল ; কলিকাতা
		ভবানীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
হরিশ	...	ঐ সহোদর, উকিল
রমেশ	...	ঐ খুড়তুতো ভাই
মণীন্দ্র	}	
হবিচরণ		...
বিপিন		গিরীশের পুত্র
অতুল	...	হরিশের পুত্র
কানাট	...	রমেশের পুত্র (প্রথমা পত্নীর)
পটল	...	ঐ পুত্র
হরলাল	...	গিরীশের পুরাতন ভৃত্য
গণেশ চক্রবর্তী	...	গিরীশের গৃহ-সরকার
বেহারী	...	গ্রাম্য-ভিখারী

স্ত্রী

সিন্ধুখরী	...	গিরীশের স্ত্রী
নয়নতারা	...	হরিশের স্ত্রী
শৈলজা	রমেশের স্ত্রী
নীলা	...	গিরীশের কন্যা

নিষ্কৃতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন কক্ষ

ঘরটি, আসবাব পত্রে সুসজ্জিত। সম্পূর্ণ আভিজাত্যের ছাপ রক্ষা করিতেছে। ছইটি
প্রাচীনতর পালক পাশাপাশি পাতিয়া তাহার উপর বিস্তীর্ণ শয্যা পাতা হইয়াছে। এই
শয্যার এক পার্শ্বে অসুস্থ সিদ্ধেশ্বরী কোন রকমে তাহার একটু জায়গা করিয়া শুইয়া
আছেন। পালকের নীচে অর্থাৎ বেথের উপর কানাই একটি টেনিল ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া
সোৎসাহে চীৎকার করিয়া ভূগোল পড়িতেছে এবং বিপিন ততোধিক চিৎকার করিয়া
কাষ্ট'বুক পড়িতেছে। খাটের উপর হরিচরণ মনোযোগের সহিত বহিষচন্দ্রের “আনন্দমঠ”
পড়িতেছিল। পার্শ্বে আর একখানি পাঠ্য পুস্তক বালিশের উপর থোলা অবস্থায় পড়িয়া
থাকিতে দেখা গেল। পটল লেপ মুড়ি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর এক পাশে শুইয়া আছে।
তাহাকে দেখা বাইতেছে না। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কানাই ও বিপিন
বেশরূপ চীৎকার করিয়া পড়িতেছিল তাহাতে সিদ্ধেশ্বরী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং
চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন।

একযোগে { কানাই। যে বিস্তীর্ণ জলরাশি বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত
পড়িতেছে { তাহাকে বঙ্গোপসাগর বলা হয়—
বিপিন। The Ram—রাম মানে ভেঁড়া—

গিরীশ প্রবেশ করিলেন

গিরীশ। কি গো! এ বেলায় কেমন আছ?

সিদ্ধে। ভালই আছি।

গিরীশ। ভাল যা আছ, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু ব্যাপার কি?
তোমার ঘরে বসে কানাই বিপিন এরা সোৎসাহে চিৎকার করে
পড়াশোনা করছে যে?

সিদ্ধে। বুঝতে পারছ না? ছোটবৌ যে বাড়ী নেই!

গিরীশ। বাড়ী নেই? সেকি! কোথায় গেলেন?

সিদ্ধে। পটলডাকায়। তার মাসির বাড়ী—

গিরীশ। কখন গিয়েছেন?

সিদ্ধে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর।

গিরীশ। দেখ দেখি, সেই দুপুরে গিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত আসেন নি—
মহা-ভাবনার কথা হোল দেখছি—

সিদ্ধে। বলে বকমারি করেছি। বলি, এতে ভাবনার কি আছে?
তোমার কত বাজে ভাবনা! মাসীর বাড়ী কতদিন পরে সে
গেছে—তোমার জন্তে কি দু-পাঁচ ঘণ্টা থাকতেও পারবে না।

গিরীশ। না না, থাকুন না তার জন্তে ত নয়—কিন্তু সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি
হয়ে গেল—সেই পটলডাকা থেকে ভবানীগুরে আসা—

সিদ্ধে। আসবে ত ঘরের গাড়ীতে। হেঁটে ত আর আসবে না।
তাতে ভাবনার কি আছে?

গিরীশ। তা তাঁকে আনবার জন্তে গাড়ী গেছে ত?

সিদ্ধে। সে বলে গেছে, আসবার সময় তার মাসীর বাড়ীর গাড়ীতেই
আসবে।

গিরীশ। তিনি ছেলেমানুষ বলেন বলে, তুমি অম্নি তাতে মত দিলে ?
না না, এ ত ঠিক হয়নি। আমাদের ঘরের বোঁ। আমাদেরই নিয়ে
যাওয়া নিয়ে আসা উচিত। তা ছাড়া ঘরে যখন গাড়ী রয়েছে—
আমরা তাঁদের ওপর এ ভারটা চাপাতে যাই কেন ?

সিদ্ধে। (বিরক্ত-ভাবে) তা অত যদি সহ্যই কোচম্যানকে বলে
দাও গাড়ী জুড়ে নিয়ে যাক্।

গিরীশ। সেই ভাল। তাই বলে দিই—

এহানোহুত

সিদ্ধে। এমন ব্যস্তবাগীশ মানুষও দেখিনি ! ছেলেমানুষ ছুটো দিন যে
কোথাও গিয়ে থাকবে তারও উপায় নেই—

গিরীশ। (ফিরিয়া) তা কি বলছ ? গাড়ী কি তাহলে পাঠাব ?
না—না ?

সিদ্ধে। না পাঠাতে হবে না। তার যখন সুবিধে হবে সে আপনি
আসবে। (ছেলেদের প্রতি) নে তোরা পড়—

গিরীশ অনন্তোপায় হইয়া চলিয়া গেলেন। ছেলেরা সোৎসাহে যথারীতি
পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পড়ার পর, বিপিন সিদ্ধেশ্বরীর
সুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল।

বিপিন। আজ আমার ভানদিকে শোবার পালা না বড়মা ?
কানাই। না বিপিন, তুমি না, বড়মার ভান দিকে শোব আজ আমি।
বিপিন। বা রে ! তুমি ত কাল শুয়েছিলে সেজদা ?
কানাই। কাল শুয়েছিলুম ? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে আমি বা
দিকে—

পটল। (লেপের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল) এ্যা ! বা দিকে
বৈ কি ! আমি ব'লে বড়মার বা দিকে শুয়ে রয়েছি এতক্ষণ—

কানাই। বড়ভায়ের সঙ্গে তর্ক ক'রো না বলে দিচ্ছি, মাকে ব'লে মেব।

পটল। (সিন্ধুখরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কঁাদ কঁাদ স্বরে বলিল) তুমি সেজদাকে বল না বড় মা, আমি কতক্ষণ ধরে শুয়ে আছি যে—
কানাই। (শাসনের স্বরে) ফেরু পটল !

ছেলেদের তর্কাতর্কির মাঝে শৈলজা কখন যে নরনার কাছ ছুঁধের বাটা হাতে
করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই,
শৈলজা বিরক্তভাবে কহিলেন।

শৈলজা। ওরে বাবারে, বাবা—একে দিদির অস্থখ! তার ওপর সব
ষাঁড়ের মত চোঁচাচ্ছে দেখ না! ঘরে যেন ডাকাত পড়েছে!

শৈলজাকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গেল—হরিচরণ
'আনন্দবর্ঠ' বালিশের ভলায় লুকাইয়া রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লাগিল, কানাই চাঁৎকার
করিয়া 'বে বিস্তীর্ণ জলরাশি' ইত্যাদি ভূগোলের শব্দগুলি আঙড়াইতে লাগিল। পটল ও
বিপিন ভয়ে জড়সড় হইয়া লেপের মধ্যে মুখ লুকাইল। শৈলজা কহিলেন।

শৈলজা। ওরে ও “বিস্তীর্ণ জলরাশি” এতক্ষণ হ'চ্ছিল কি?

কানাই। (সভয়ে) পড়ছিলাম—

শৈলজা। পড়ছিলে? পড়ছিলে না ঝগড়া করছিলে?

কানাই। (সভয়ে) আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

শৈলজা। কোথায় গেল তারা? কাউকে দেখছি না যে—এরা সব
পালাল কোথা দিয়ে?

কানাই। কেউ পালায় নি মা, ওরা সব ঐ লেপের ভেতর ঢুকেছে—

শৈলজা। (হাসিয়া) দিদি তোমাকে খেয়ে ফেলে যে! নির্দিষ্টবাদে চুপ-
চাপ মড়ার মত কী ক'রে যে প'ড়ে থাক, তা তুমিই জান। হাত না

হয় তোমার নাই উঠে, তাই বলে কী একবার ধম্কাতেও পার না ?
(বিশিণ ও পটলের গা হইতে লেপ খুলিয়া লইয়া) ওরে—এইসব
ছেলেরা বেরো—চল আমার সঙ্গে—

সিন্ধেশ্বরী । ওরা যা কচ্ছে তা কচ্ছে, তা তুইই বা বিরক্ত হচ্ছিস কেন ?
শৈলজা । বিরক্ত হ'বো না, একে রোগের জ্বালা, তার ওপর এই ছেলে-
দের চাঁৎকার—একি ভাল লাগে ?

সিন্ধেশ্বরী । ই্যা আমার ভাল লাগে, তোকে বক্তেও হবে না আর
মারধোরও করতে হবে না—যা তুই এখান থেকে । লেপের ভেতর
ছেলেরা সব হাঁপিয়ে উঠেছে !

শৈলজা । (হাসিয়া)—আমি কী ওদের শুধু মারধোরই করি দিদি ?

সিন্ধেশ্বরী । করিস বৈ কি শৈল, বড্ড করিস ; তোকে দেখলে ওদের মুখ
ধেন কালীবর্ণ হয়ে যায় । আচ্ছা বা না বাপু ওদের স্বমুখ থেকে,
ওরা বেরুক ।

শৈলজা । আমি ওদের নিয়ে তবে যাব । অমন করে দিবারাত্রি জ্বালাতন
করুলে তোমার অস্থখ সারবে না ।

সিন্ধেশ্বরী । ছেলেপুলে কাছে থাকলে অস্থখ যদি না লাগে, ত না সারুক ;
আমি অমন খালি বিছানায় শুতে পারি না ।

শৈলজা । বেশ ত ! খালি বিছানায় শুতে যদি তোমার কষ্ট হয়, পটল
সবচেয়ে শান্ত, সেই শুধু তোমার কাছে শোবে, আর সকলকে আজ
থেকে আমার কাছে শুতে হবে । এখন তুমি ওঠো দেখি, এই
ছুটুকু খেয়ে নাও । (সহসা হরির প্রতি) ইয়ারে হরি ? সাড়ে ছটার
সময় তোমার মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত ?

হরিচরণ । (আমতা আমতা করিয়া) ওষুধ কই ! তা ত—

শৈলজা । বুঝতে পেরেছি ; মনে ছিল না ?

সিন্ধেশ্বরী। ওষুধ টোষুধ—আর আমি খেতে পারব না শৈল।

শৈলজা। (গম্ভীর হইয়া) তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চূপ কর।

আমি হরির কাছে জবাব চেয়েছি, কেন সে ওষুধ দেয় নি—

হরি। (ভীতকণ্ঠে) মা খেতে চান না যে—

শৈলজা। তিনি খেতে চান বা না চান, তুই দিতে গিয়েছিলি কিনা

তাই বল?

সিন্ধেশ্বরী। (বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন তুই আবার এখন হাত্কা মা

করুতে এলি বলত শৈল? ওরে ও হরিচরণ! কী ওষুধ টোষুধ

আমাকে দিবি দেনা বাবা শীগ গির ক'রে।

হরিচরণ খাট হইতে ব্যস্তভাবে নামিয়া ঔষধের গেলাস ও শিশি লইয়া

ছিপি খুলিতে গেল—শৈলজা বাধা দিয়া কহিল।

শৈলজা। শুধু গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হোল? জল চাইনে? মুখে

দেবার কিছু চাইনে? তোদের এক'শবার বারণ ক'রেছি না যে,

ব্যাগার ঠেলা কঁাজ তোরা করবি নে।

হরি। কোথাও কিছু নেই যে খুঁড়িমা, মুখে দেবার কী দেবো?

শৈলজা। না আনলে, কিছু কী উড়ে আসবে?

সিন্ধেশ্বরী। ও কোথায় কী পাবে যে দেবে? এ সব কি পুরুষ মানুষের

কাজ? তোরা যত শাসন ওই ছেলেদের ওপর। কেন নীলাকে

ওষুধটা দেওয়ার কথা বলে যেতে পারিস নি? সে মুখপোড়া

মেয়ে, একবারও এ ঘর মাড়ায় না। চেয়ে দেখে না যে, মা মরেছে

কি বেঁচে আছে।

শৈলজা। তার ওপর তুমি শুধু শুধু রাগ করছ দিদি, সে কি বাড়ীতে

ছিল? সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় আমার মাসিমার বাড়ীতে

গিয়েছিল যে!

সিন্ধেশ্বরী। তুই গেলি তোর মাসীর বাড়ী, তা ওকে নিয়ে গেলি আবার
কোন হিসেবে ?

শৈলজা। (হাসিয়া) ও আমার মাসীমার সতীন কিনা, তাই—

সিন্ধেশ্বরী। তোর হয়েছে একচোখো ভালবাসা !

শৈলজা। ও কথা বলোনা দিদি, মেয়ে আজ বাদে কাল খণ্ডর বাড়ী যাবে,

তখন কি আর পাঁচ জায়গায় যাওয়া-আসা করুতে পারবে ?

সিন্ধেশ্বরী। দে হরিচরণ, ওষুধ ঢলে দে, আমি অমুনি খাব।

হরিচরণ ওষুধ ঢালিতে উজ্জত হইল, শৈলজা বাধা দিয়া বলিলেন।

শৈলজা। তুই থাম্ হরি, আমি দিচ্ছি।

প্রস্থান

সিন্ধেশ্বরী। যা হরি, তুই পড়্গে যা—

হরিচরণ। খুড়িমা আগে আসুন, তোমার ওষুধ খাওয়া হোক, তারপরে
যাচ্ছি।

নীলার প্রবেশ

নীলা। এ বেলা কেমন আছ মা ?

সিন্ধেশ্বরী। ভালই আছি। তোর সতীনকে দেখে এলি ?

নীলা। হ্যাঁ। খুড়িমার মাসীমা এত আদর যত করেন, যে তোমায় কী
ব'লব মা !

শৈলজার প্রবেশ—তাহার এক হাতে রেকাবীতে কিছু

কাটা কল, অপর হাতে জলের গেলাস।

শৈলজা। সতীনের প্রশংসায় ত পঞ্চমুখ ! এদিকে যে দিদির ওষুধ
খাওয়া হয়নি, সে খেয়াল আছে ?

শৈলজা শিশি খুলিয়া ওষুধ ঢালিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিলেন ।

শৈলজা । নাও, এ টুকু খেয়ে নাও ।

সিদ্ধেশ্বরী ওষুধটুকু খাইলেন ও জল খাইয়া একটুকুরা ফল মুখে দিলেন ইতিমধ্যে নয়নতারা তার পুত্র অতুলকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন । অতুল বার চৌদ্দ বছরের বালক । সাহেবী পোষাকে সজ্জিত । গারে একটি নতুন কোট । নয়নতারা অতুলকে সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ধরিয়া গারের কোটটি দেখাইয়া বলিলেন ।

নয়ন । দিদি, দর্জি অতুলের এই কোটটা তৈরী ক'রে এনেছে—কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে—

সিদ্ধেশ্বরী । এই জামার দাম কুড়ি টাকা !

নয়ন । এ আর বেশী কী দিদি ? আমরা যখন বিদেশে থাকতাম, তখন আমার অতুলের এক একটা স্ট্র কর্তে ষাট-সত্তর টাকারও বেশী—
লেগে যেত ।

সিদ্ধেশ্বরী । (আশ্চর্য্য হইয়া) স্ট্র !

নয়ন । ই্যা, স্ট্র । বুঝতে পারলে না, এই কোট, প্যান্ট, নেক্টাই, একে আমরা স্ট্র বলি ।

সিদ্ধেশ্বরী । ও ! শৈল কুড়িটা টাকা মেজ বৌকে এনে দে তো ?

শৈলজা । দিচ্ছি :

শৈলজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

নয়ন । তুমি না পার চাবিটা আমাকেই দাও না, আমিই না হয় বার করে নিচ্ছি ।

নীলা । চাবি মা কোথায় পাবেন ? লোহার সিন্দূকের চাবি বরাবর খুড়িমার কাছেই থাকে । তাই তো খুড়িমা চলে গেলেন, টাকা বের করে আনতে ।

নীলার প্রস্থান

নয়ন। ওঃ!

অতুল সিঙ্কেবরীর সম্মুখে আগাইয়া গিয়া—

অতুল। দেখত জেঠিমা কোটুটা কেমন হয়েছে?

সিঙ্কেবরী। খুব ভাল হয়েছে।

অতুল। কোট কাটা ভয়ানক শক্ত। সব দক্ষিণ ভাল ভাবে কোট কাটতে পারেনা। এর সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে—হাতের সঙ্গে কাঁধটা মিলিয়ে জোড়া।

ইতিমধ্যে শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিলেন ও অতুলের হাতে
দুখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিলেন।

শৈলজা। এই নাও অতুল।

অতুল টাকাট হাতে লইল।

নয়ন। ছেলেটির তোরঙ্গ-ভরা পোষাক, তবু জামা তৈরীতে আশ
মেটে না।

অতুল। কত-বার বলব মা তোমায়, আজকালকার ক্যাশানই এই
রকম, কাট-ছাঁট অন্ততঃ ভাল না হলে লোকে হাসবে যে—

অতুল চলিয়া বাইতে বাইতে কিরিয়া হরিচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

অতুল। আমাদের এই হরিদা যা গায় দিয়ে বাইরে যায়, দেখেতো
আমার লজ্জাই করে। এখানে ঝুলে আছে, এখানে কুঁচকে আছে,
ছিঃ ছিঃ! কি বিচ্ছিরিই না দেখায়! হরিদা ঐ সব জামা গায় দিয়ে
যখন বেড়ায়—দেখে মনে হয়, যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্ছে—

অতুল কথা শেষ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নয়নভায়াও হাসিয়া
উঠিলেন। হরিচরণ শৈলজার মুখের দিকে করুণ নেত্র চাহিল।

সিঙ্কেবরী মনে ব্যথা পাইলেন।

সিন্ধেশ্বরী। সত্যিই তো ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই
শৈল! দে না বাছাদের দুটো একটা নতুন জামা তৈরী করিয়ে?
অতুল। আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দজ্জিকে দিয়ে
দস্তর-মত তৈরী করে দেব, হুঃ হুঃ বাবা! আমাকে ফাঁকি দেবার
যো নেই।

শৈলজা। তোমাকে আর জ্যাঠামো করতে হবেনা অতুল, তুমি
তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, ওদের জামা তৈরী করাবার
লোক আছে। (অগ্ন্যান্ত ছেলেদের প্রতি) চ—চ—খাবি চ।

ছেলেদের প্রস্থান।

শৈলও বিরক্তভাবে প্রস্থানোত্তোত।

নয়ন। দাদি ! ছোট বোএর কথা শুনলে? কেন? অতুল আমার
কী অগ্নায় কথা বলেছে?

শৈলজা যাইতে যাইতে কিরিয়া কহিলেন।

শৈলজা। ছোট বোয়ের কথা দিদি অনেক শুনেছেন, তুমিই শোননি।
অতুল ছোট ভাই হয়ে, হরিকে ধেমন করে ভেদালে তাতে তোমার
কোথায় বকা উচিত ছিল, তা নয়, তুমি হাসলে! ও যদি আমার
পেটের ছেলে হতো, তাহলে আজ আমি ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম।

প্রস্থান

অতুল। শুনলে মা! শুনলে? এ্যা—জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম!

অতুলের প্রস্থান

নয়ন। আজ আমার অতুলের জন্মবার আর ছোট বো মা মুখে এলো
. তাই বলে গালাগাল দিয়ে চলে গেল! এ রকম নিত্য খিটিখিটির

মধ্যে আমরা তো থাকতে পারব না দিদি। তুমি নিজেকে কিছু না করে দিলে, আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

আমি কারো খাইও না পরিও না, যে মুখ বুজে ঝাঁটা খাব।

সিদ্ধে। সেকি! ঝাঁটা মারবে কেন মেজ বোঁ! ওর ঐ বকমই কথা—। তাছাড়া তোমাকে তো বলেনি—

নয়ন। আর কী করে বলে? অভুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল।

আমি নাকি খিলখিল করে হেসেছি! শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকনি দিদি। আবার ঝাঁটা মারে কী করে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন উঠেনি?

সিদ্ধে। ওকি কথা মেজবোঁ? আমি কী তাকে শিখিয়ে দিয়েছি?

নয়ন। শিখিয়ে দিয়েছ কি না দিয়েছ তা তুমিই জান। কেউ কারো মন জানতে যায়না দিদি, চোখে দেখে কানে শুনেই বলতে হয়। এত কাল বিদেশে কাটিয়ে দুটি ভাই এক জায়গায় থাকতে পাবেন বলে, উনি চলে এলেন। ছুভায়ের এক জায়গায় থাকা তোমার যদি পছন্দ না হয়, তোমার সংসারে এসে আমরা যদি আপদ বালাই হয়ে থাকি; বেশ তো, সে কথা তুমি নিজেকে বললেই ত পার। আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

সিদ্ধে। সেকি! আমি লেলিয়ে দিয়েছি?

নয়ন। আমরাও ঘাস খাইনে, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না ভাড়িয়ে—দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলে তো দেখতে শুনতে ভাল হয়। আর, আমরাও সমানে চলে বাই। উঃ! উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন! যাকে তাকে বলে বেড়ান—আমাদের বৌঠাকরুণ মাহু বন, সাক্ষাৎ—ঠাকুর দেবতা।

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) এমন অপবাদ আমার শত্রুও দিতে পারে না

মেজবো। এসব কথা ঠাকুরপোকে শুনানোর চাইতে আমার মরা ভাল। তোমরা বিদেশ থেকে কতকাল পরে ফিরে এসেছে বলে, আমার যে কী আনন্দ হয়েছে—তা তোমাকে কী বলব। যদি তুমি বিশ্বাস না কর, আমার ছেলেদের কাউকে না হয় আন, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথা শেষ হইবার পূর্বে শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল।

শৈল। একি! এখনও দুখটুকু খাওনি দিদি।

সিন্ধে। (কাঁদিয়া) তুই বের হয়ে যা—আমার স্বমুখ থেকে। দূর হয়ে যা। তোর যা মুখে আসবে, তুই তাই লোককে বলবি?

শৈল। বাঃ রে! কাকে আবার কী বলেছি?

সিন্ধে। কাকে কী না বলছি! তাই শুনি? আমাকে বলে বলে তোর বুকের পাটা বড় বেড়ে গেছে? না? কে তোর কথার ধার ধারে রে? সবাইকে ‘কী তুই দিদি পেয়েছিস? দূর হ—আমার স্বমুখ থেকে—

শৈল। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, দুখটা আগে খেয়ে নাও, এই বাটিটায়—আমার দরকার আছে।

সিন্ধে। খাব না, কিছু খাব না, তুই যা—আজ হয় তুই বাড়ী থেকে দূর হ—না আমি বাড়ী থেকে দূর হই, দুটোর একটা না করে আমি জল-স্পর্শ করব না।

শৈল। আমি তো এই সেদিন বাপের বাড়ী থেকে এসেছি দিদি, এখন আর যেতে পারবো না। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার বাপের বাড়ী কাটোয়ায় গিয়ে দিনকতক থাক। কাছেই গঙ্গা—অমনি বার করে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কী তুচ্ছ কথা নিয়ে

তোলপাড় কচ্ছ বলো তো ? রোগে ভুগে ভুগে দিদি আধমরা হয়েছেন, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি, সে কথা দিদিকে না বলে আমাকে বললেই তো হয়।

সিদ্ধে। তুই লোককে যা তা বলবি, আর লোকে বলবে না ? আজ অতুলের জন্মদিন, কেন বাছাকে তুই এমন কথা বললি ?

শৈল। বাঃ রে ! কি আবার এমন বলেছি।

সিদ্ধে। বলিসনি ? জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম কেন বলি ?

শৈল। (হাসিয়া) ও ! এই কথা, কিছু ভয় কর না মেজদি, তোমার মত আমিও তো মা। আমার হরিচরণ, কাছ, পটল যেমন, অতুলও তেমনি। মায়ের গালাগালি লাগে না। মেজদি। আচ্ছা, আমি অতুলকে ডেকে আশীর্বাদ করছি ; তা হলে হবে তো ? নাও দিদি, তুমি দুখটুকু খেয়ে নাও—আমি আবার উঠুন কড়া চড়িয়ে এসেছি।

সিদ্ধে। আচ্ছা তুই আগে তোব মেজদির কাছে মাশ্ চা—ঘাট্ মান, তারপরে খাচ্ছি।

শৈল। আচ্ছা মানছি।

শৈল হেঁট হইয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া বলিল।

শৈল। আমি যদি কোন অত্যাচার করে থাকি মেজদি, মাফ করো, আমি ঘাট্ মানছি।

নয়নতারা গভীরভাবে শৈলের হাত দুইট ধরিয়া তুলিল। কোন কথা কহিল না।

শৈলজা ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর নিকট আগাইয়া আসিয়া কহিল।

শৈল। সব গুণগোল তো মিটে গেল ; এবার দুখটুকু খাও দিদি।

শৈলজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সম্মুখে সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন।

সিদ্ধে। এ পাগলীর কথায় কোন দিন রাগ করো না মেজবো ! এই

আমাকেই দেখনা, ওকে বকি বকি, কত গালাগাল মন্দ করি, কিন্তু
 একদণ্ড ওকে দেখতে না পেলে, বুকের ভেতর যেন কী রকম করে !
 (শৈলর প্রতি) কিন্তু এত দুখ তো খেতে পারবো না দিদি ।

শৈল । খুব পারবে । যাও ।

সিঁকেবরী দুধটুকু শেষ করিলেন ও পরে কহিলেন ।

সিঁকে । তোরা কথা রাখলাম কিন্তু এখুনি অতুলকে ডেকে আশীর্বাদ
 করিস্ শৈল ।

শৈল । এক্ষুণি করছি ।

এই বুলিয়া দুধের বাটি লইয়া শৈলর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছেলেদের পড়িবার ঘর

ঘরের মধ্যস্থলে একটা টেবিল পাতা, টেবিলের চারদিকে চারখানি চেয়ার, টেবিলের উপর দোহাত কলম বই খাতা ইত্যাদি ছড়ান। ঘরে কয়েকটি মাত্র ছবি ক্যালেন্ডার ইত্যাদি। একটি র্যাকে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক। অতুল ও হরিচরণ চেয়ারে বসিয়াছিল। উভয়কে দেখিয়া মনে হয়, বিশেষ চিন্তিত। অতুলের পরণে ব্লু-প্যাণ্ট হাঙ্ক-সার্ট। হরিচরণের পরণে আধময়লা কাপড় জামা।

হরিচরণ। হাজার হোক ছোট খুড়িমা আমাদের গুরুজন, উনি যদি বকেই থাকেন, তাতে কী আর আমাদের রাগ করতে আছে?
অতুল। ওঃ! ভাবি তো খুড়ি! ও কি আমাদের আপনাত
খুড়ি নাকি?

হরি। উনি আমাদের আপনাত খুড়িই তো।

অতুল। তুমি কিছু জান না হরিদা। ছোট কাকা হচ্ছে—বাবা জেঠা-মশায়ের খুড়তুতো ভাই। দয়া করে ওঁরা ওকে এঁ বাড়ীতে থাকতে দিয়েছেন তাই।

হরি। ছিঃ! ও সব কথা বলতে নেই অতুল।

অতুল। না। বলবে না বৈকি? আমি কারো ধার ধারি না বাবা।
এ শর্মা অতুলচন্দ্র বেগে গেলে ছোট খুড়ি টুড়ি কাউকে
কেয়ার করে না।

হরিচরণ চারিদিকে সম্বরণে চাহিয়া বলিল।

হরি। অবশ্য বেগে গেলে আমিও করি না।

ইতিমধ্যে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হরলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার
 হাতে, অতুলের নতুন কোটটি দেখা গেল। সে কোটটি বুড়িয়া
 লইয়া আসিয়াছিল। অতুলকে দিয়া কহিল।

হরলাল। এই নাও, জামাটা গায়ে দাও। রাগ করে জামা গায়ে না
 দিয়েই চলে এসেছে? মেজবোমা আবার আমায় দিয়ে পাঠিয়ে
 দিলেন। নাও পরে ফেল।

হরলালের নিকট হইতে জামাটা লইয়া অতুল কোণে ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিল।

অতুল। যা! আমি পরতে চাই না। কোটটা আনার ছিরি দেখ
 না! পাড়াগাঁয়ের ছৃত কোথাকার! কী করে জামা আনতে
 হয় জান না?

হর। কী করে জানব বল, ও সব জামা কী কখনো গায়ে দিয়েছি?
 চিরদিন গায়ে গামছা দিয়েই কেটে গেল, ছোটমার কল্যাণে তবু
 এখন যা হোক একটা ফতুয়া উঠেছে।

অতুল। (ভেঙাইয়া) এটা তোমার ফতুয়া নয়—কোট। ওর ইস্তিরি
 নষ্ট হয়ে গেলেই সব গেল।

হর। তাই নাকি? তা এবেলা না হয় কোন রকমে গায়ে দাও।
 ওবেলায় আমি আবার ইস্তিরি করে এনে দেব।

অতুল। তোমাকে ইস্তিরিও করে এনে দিতে হবে না—আর আমি
 পরতেও চাই না।

হর। উঃ! তুমি যে বড় কড়া সাহেব দেখছি গো! তবু যদি গায়ের রংটা
 কটা হতো।

অতুল। (ধম্কাইয়া) চুপ্ কর বুড়ো জানোয়ার কোথাকার! চাকর,
 চাকরের মত থাকবি।

হরি। ছি, ছি! অতুল, হরলালদাকে কি ওসব কথা বলতে আছে?

মা শুনলে রাগ করবেন যে।

অতুল। রাগ করলেন তো বড় বইয়েই গেল। তোমাদের সবই বিচ্ছিন্ন। বাড়ীর চাকরকে দাদা! বাজার সরকার ঐ গণেশ চক্রবর্তীকে জ্যেষ্ঠামশাই এসব বলা আমার ধাতে সইবে না।

হর। তা জানি ছোট সাহেব, তোমার ধাতটা একটু চড়া এবং কড়া। তাই জামাতেও তোমার কড়া ইস্তিরীর সরকার হয়। কিন্তু দেখ ছোট সাহেব, সবদিকে মানুজাটা অত কড়া না দিয়ে, একটু নরম করার চেষ্টা করো। নইলে কারুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না। অতো কড়া মানুজার স্ত্রীতে ঘুড়ি পড়লে যে সব কেঁচু কেঁচু করে কেটে যাবে—

এখানে

অতুল। তোমরা চাকর বাকর রাখতে জান না হরিদা। তোমাদের আদ্বারাতেই তো ওদের এত আশ্রয় হয়েছিল। চাকর বাকরদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে কি মান থাকে?

হরি। কিন্তু বাড়ীর লোকজনদের হেনস্থা করা যে বাবা মা মোটেই পছন্দ করেন না।

অতুল। না করলেন তো বইয়েই গেলো—আমার সঙ্গে বেশী চালাকী করতে এলে এবার দেব দু'ঘা বসিয়ে।

ইতিমধ্যে কানাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল।

কানাই। মেজদা, সেজদা ছোট খুড়িমা ডাকছেন, চটপট চলে এসো—

হরি। ছোট খুড়িমা আমাকে ডাকছেন? কখনো না। আমি তো কিছু করিনি! যাও অতুল, ছোট খুড়িমা বোধহয় তোমাকেই ডাকছেন।

কানাই। না, না, তোমাকে আর সেজদা কে—দুজনকেই ডাকছেন।
এক্ষুণি চলে এসো।

কানাই ঘর হইতে বাহির হইয়া বাইবার সময় অতুলের কোটটা
মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল।

কানাই। এঁা! সেজদা তোমার নতুন কোটটা মাটিতে কেলৈ
দিলে কে?

কানাই কোটট চোরার হাতলের উপর রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরি। চলো অতুল, ছোট খুড়িমা যখন ডেকেছেন তখন আর দেরী
করে লাভ নেই। *টার সঙ্গে দেখা করিগে ঘাই—চল। আমার
আর ভয় কী, আমি তো কিছু বলিনি, তুমিই বলেছো ছোট
খুড়িমাকে কেয়ার কর না।

অতুল। আমি একা বলিনি, তুমিও বলেছো। কিন্তু কথাটা তো
বলেছি—আমরা দুজনে একটু আগে, এই ঘরে, তুমি আর আমি
ছাড়া তখন তো আর কেউ ছিল না। এর মধ্যে কথাটা তার কানে
গিয়ে পৌঁছলো কী করে? ঐ ছোট খুড়ির চর হরলাল ব্যাটা
পেছন থেকে কিছু শোনেনি ত?

হরি। ছোট খুড়িমাকে কিছু শুনতেও হয় না, দেখতেও হয় না।
তিনি আপনিই বুঝতে পারেন।

অতুল। ওঃ! একেবারে ভগবান! বলেছি—বেশ করেছে।

অতুল সগর্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিচরণ সঙ্কল্প

সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

বাড়ীর অন্দরমহল

পাশাপাশি ছুখানি ঘর। একটি ভাঁড়ার ঘর, অপরটি রান্নাঘর। ঘরের সংলগ্ন বারান্দা সমুখে প্রশস্ত উঠান। উঠানের একপাশে কল ও চৌবাচ্চা। রান্নাঘরের খোলা জানালা দিয়া শৈলজাকে রান্নার কাজে ব্যস্ত দেখা গেল। নীলা রান্নাঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বসিয়া গান করিতেছে। তখন বেলা ৯টা—১০টা।

নীলার গান

প্রভু তোনার চরণ ধূলি

পড়বে যবে—

সেদিন তিমির-ভরা এই আঙ্গিনা

তীর্থ হবে।

তোমার আসার আশায় আঁখি

রইবে চেয়ে—

ধস্ত হবে পরাণ আমার

তোমার পেয়ে।

মোর নয়নে তোমার জ্যোতি

উঠবে ফুটে কবে।

(সেদিন) নয়ন জলে ধুইয়ে চরণ

করব তোমার করব বরণ

ধুইয়ে চরণ,

আঁখিতে মোর মিলিয়ে আঁখি

তুমি পরাণ জুড়ে রবে ॥

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সগর্বে অভুলকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।

সঙ্গে হরিচরণ। নীলাকে দেখিয়া অভুল জিজ্ঞাসা করিল।

অতুল। ছোট খুড়ি কোথায় রে নীলাম্বি ?

নীলা। (রান্নাঘরের দিকে হাত বাড়াইয়া) ঐ যে রান্না ঘরে।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে শৈলজা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শৈল। কে রে নীলা ?

নীলা। মেজদা আর অতুল !

ইতিমধ্যে অতুল জুতা পায়ে দিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

শৈলজা রান্নাঘরের দরজার নিকট আসিয়া কহিলেন।

শৈল। অতুল এসেছি? দাঁড়া বাবা।

হঠাৎ পারের দিকে নজর পড়িতেই শৈলজা কহিলেন।

শৈল। ও কি রে ? জুতো পায় দিয়ে কি এদিকে আসে ?

অতুল। কেন ? জুতো পায় দিয়ে এলে কী হয় ?

শৈল। এয়ে হেঁচলে। হেঁসেলে কী জুতো পায় দিয়ে ঢুকতে আছে ?

অতুল। আমি তো ঘরের ভেতরে যাইনি, বাইরে আছি।

শৈল। বাইরে থাকলেও, এদিকে কেউ জুতো পরে আসে না।

অতুল। কিন্তু এখানে জুতো পরে এলে কী দোষ হয়, আমি জানতে চাই—

শৈল। তর্ক করো না অতুল, দোষ আছে, তুমি এদিকে যাও। যাও—

অতুল। বাবে! আমরা তো চুঁচড়োর বাড়ীতে জুতো পরে রান্না ঘরে যেতুম। আর এখানে ঘরের বাইরে দাঁড়ালেও দোষ !

শৈল। হ্যা! যেখানকার যা নিয়ম। যা বলছি শোন।

অতুল। আমি ওসব নিয়ম মানি না।

ইতিমধ্যে হরিচরণের বড় ভাই নগীন্দ্র ডাখল তাঁজিমা বর্সাক কলেক্টরে সেখান দিয়া

চলিয়া বাইতেছিল। অতুলের তর্কে সে খনকিয়া দাঁড়াইল এবং শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিল,
নীলা তাহার হইয়া উত্তর দিল।

মণীন্দ্র। কী হয়েছে খুড়িমা?

নীলা। অতুল জুতো পায় দিয়ে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল,
ছোট খুড়িমা বারণ করছেন বলে, তর্ক করছে—

মণীন্দ্র। এই অতুল এদিকে আয়—

অতুল। না বাব না। এখানে জুতো পরে এলে কী হয় কী?

মণীন্দ্র। যাই হোক না কেন, তোকে যখন বারণ করছেন, তুই
চলে আয় না?

অতুল। না আমি বাব না—

মণীন্দ্র। (বিরক্তভাবে) যাবি নে?

অতুল। না। ছোট খুড়ি আমার দেখতে পারে না বলেই শুধু শুধু
এই রকম করছে।

মণীন্দ্র ছুটিয়া গিয়া অতুলকে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিল এবং কান ধরিয়া কহিল।

মণীন্দ্র। হতভাগা বাদর! ছোট খুড়ি নয়—ছোট খুড়িমা। করছে
নয়—করছেন বলতে হয় ইতর কোথাকার!

মণীন্দ্র অতুলের কান ছাড়িয়া দিবামাত্র অতুল কয়েকটি

কিলু খুঁসি মণীন্দ্রকে বসাইয়া কহিল।

অতুল। তুমি ইতর! আমার গায়ে হাত দেবার তুমি কে হে? ছোট
লোক শূয়ার! গাধা!

মণীন্দ্র পুনরায় ঝুঁকিয়া অতুলকে মারিতে বাইতেছিল,

অতুল চীৎকার করিয়া কহিল।

অতুল। ও গো! কে কোথায় আছ—শিগগীর এসো গুণাটা আমাকে
মেরে ফেললে।

চোঁচামেচি ও গোলমাল শুনিয়া এক দিক হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও অপর দিক হইতে
নয়নতারা ছুটিয়া আসিলেন। নয়নতারা অতুলকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া
বলিলেন।

নয়ন। ওরে! আমি কেন মরতে এখানে এসেছিলাম রে! আমার
অতুলকে একেবারে মেরে ফেলেছে!

অতুল। তুমি আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মা, আমি ওই উল্লুককে
জুতো পেটা করবো।

মণীন্দ্র। কী? জুতো পেটা করবি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা,
তবে রে—

মণীন্দ্র কথিয়া মারিতে যাইতেছিল। শৈলজা বাধা দিয়া কহিল।

শৈল। মণি কী হচ্ছে কী? বাইরে যাও—যাও—যা হরি তুইও যা—

মণীন্দ্র ও হরি চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে গিরীশ ও হরিশ ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গিরীশ। কী গো! ব্যাপার কী? এত গোলমাল কিসের?

সিদ্ধে। কী জানি? মণি বুঝি অতুলকে কে মেরেছে তাই—

নয়ন। (ভাঙরের সম্মুখে লজ্জাহীনায় জ্বায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন)

মেরেছে নয়, একেবারে মেরে ফেলেছে।

গিরীশ। না, না, না, এ ত ভাল কথা নয়, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া—তা
ছাড়া তোর চেয়ে ও বয়সে কত ছোট—ছি: ছি: ছি:!

গিরীশ ভাড়-বধূদের সম্মুখে হইতে চলিয়া গেলেন। অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে শৈলজাকে
অঙ্গুলী নির্দেশে দেখাইয়া বলিল।

অতুল। ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে, আর বড়দা এসে শুধু শুধু আমাকে মারলে!

হরিশ। (চীৎকার করিয়া) ছোট বোঁমা! মণীকে তুমি কেন খুন করতে শিখিয়ে দিলে শুনি? কী ওর অপরাধ জানতে পারি কী?

নীলা। অতুল কথা শুনেনি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েছে—তাই।

নয়ন। তবে আমিও বলি ছোট-বোঁ—তোমার হুকুমে ওকে মেয়ে ফেলছিল, তাই ও প্রাণের দায়ে গাল দিয়েছে, নইলে গাল দেবার ছেলে আমার অতুল নয়—

হরিশ। নয়ই তো! তোর ছোট খুড়ীমাকে জিজ্ঞাসা কর নীলা, কথা যখন ও না শুনেছিলো, তখন আমাদের কাছে নালিশ না করে উনি অতুলকে মারতে হুকুম দিলেন কেন? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি কে যে অতুলকে শাসন করতে যান?

শৈলজা আরো খানিকটা ঘোমটা টানিয়া লজ্জার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিশ। আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি বোঁমা! ভবিষ্যতে এ রকম শাসন তুমি আমার ছেলেকে করতে যাবে না।

সিন্ধে। বেশ তো মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে, নিজে কেন শাসন করুছ? আমি বড়—আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কি বোঁকে শাসন করতে হয়—আমিই করবো। তুমি পুরুষ মানুষ—ভাগুর! একি কথা! লোকে শুন্লে বলবে কী? যাও—যাও, বাইরে যাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নয়নতারার শয়ন কক্ষ

ঘরের মধ্যস্থলে একটি খাট পাতা, একটি আলমারী। আলমারীর জিনিষ-পত্তর মেজের নামানো, ঘরের মধ্যে গোটা দুই বেডিং বাঁধা, সাংসারিক অস্বাস্থ্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ছড়ানো রহিয়াছে। মোটকথা এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার সময় ঘর-দোরের বেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, এখানেও তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। নয়নতারাকে এইসব বাঁধার ছাঁদা কাজে হরলাল সাহায্য করিতেছিল। নয়নতার হরলালকে বলিলেন।

নয়ন। ওগুলো বেশ শক্ত করে বেঁধেছিস্ তো হরলাল ?

হর। আজ্ঞে হ্যাঁ মেজ-মা, খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়েছি, বাঁধন শক্ত করে না দিলে কী চলে ? বাঁধনই হচ্ছে আসল জিনিষ, বাঁধন শক্ত না হলে, সব হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে যাবে যে—

নয়ন। সে তো ঠিক কথা বাবা।

কতকগুলি খুচরা জিনিষ-পত্তর দেখাইয়া নয়নতার কহিলেন।

নয়ন। এই গুলোর কী করা যায় বল্ তো ?

হর। খুড়ি আর কিছু দড়ি না হলে তো ওগুলো নেওয়ার সুবিধা হবে না মেজ-মা। আচ্ছা, আমি বাজার থেকে আসবার সময় দড়ি আর খুড়ি নিয়ে আসবো'খন।

নয়ন। আচ্ছা। তাহলে তোমার উপরেই ভাব রইল বাবা।

হরলাল চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া সিঁকেবরী

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে । এত গোছগাছ কিসের মেজ-বৌ ।

নয়ন । দেখতেই তো পাচ্ছে ?

সিদ্ধে । তা তো পাচ্ছি । কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে ?

নয়ন । যেখানে হোক ।

সিদ্ধে । তবু কোথায় গুনি ?

নয়ন । কী করে জানব দিদি কোথায় । উনি বাসা ঠিক কবতে গেছেন,
কিরে না এলে তো বলতে পারছি না ।

সিদ্ধে । তোমার ভাস্কর গুনেছেন ?

নয়ন । তাঁকে গুনিয়ে আর কী হবে, যার শোনার দরকার সেই ছোটগিরী
গুনেছেন ? আর আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন ।

সিদ্ধে । সে কি ! শৈল আজ সকাল থেকে ত একবার নিঃশ্বাস ফেলবারও
সময় পায়নি । সে আবার কখন এলো ?

নয়ন । তা হবে, তাহলে হয়তো আমারই দেখার ভুল হয়েছে ।

সিদ্ধে । দেখ মেজ-বৌ, এই ভুল দেখা আর ভুল শোনাতে—আমরা
যে ভুল করে বসি, তার কোনদিনই সংশোধন হয় না । আমার
হুঃখ মেজ-বৌ এমন ভাস্করের মান-মর্যাদা তোমরা বুঝলে না ।
বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনে পাবে, অনেক জ্ঞান-
জ্ঞানান্তরের তপস্কার ফলে এমন ভাস্কর পাওয়া যায় ।

নয়ন । আমরা কী সে কথা জানিনে দিদি ? হুজনে দিবারাত্র বলাবলি
করি, শুধু ভাস্কর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড় জা মেলে । তোমার
বাড়ীতে আমরা ঘর দোর খাঁট দিয়ে ঝি-চাকরদের মত থাকতে
পারি কিন্তু এখানে আর এক দণ্ডও বাস করতে পারব না ।

সিদ্ধে । এ আমার বাড়ী নয় মেজ-বৌ, এ বাড়ী তোমাদেরই, কোন
মতেই আমি তোমাদের কোথাও বেতে দিতে পারব না ।

নয়ন। যদি কখনো ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তাহলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব। কিন্তু এখানে আর একটি দিনও থাকতে বলা না। (কাঁদিয়া) আমার অতুল—হয়েছে সকলের চক্ষুশূল। অমৃতমতি দাও তাকে নিয়ে আমরা চলে যাই।

সিদ্ধে। সে কী কথা মেজ-বৌ, দৈবাৎ সেদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে, সে কথা কী মনে রাখতে আছে?

নয়ন। কোন কথাই মনে রাখতে পারিনি বলে, কত বহুনি খেয়ে মরি দিদি! ওই যখনই হলো তখনই হাউ-মাউ করে কেঁদে কেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে, আমি যে গন্ধাজল—সেই গন্ধাজল—একটা কথাও আর আমার মনে থাকে না। আমি তো সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু রাগ করতে পারবে না দিদি, তুমি যতই বল,—আমাদের ঐ ছোট বৌটি বড় সহজমেয়ে নয়। বাড়ীর সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ যেন আমার অতুলের সঙ্গে কথা না কয়।

সিদ্ধে। সে কি! *

নয়ন। বাছা মুখ চূণ করে বেড়ায় দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম,—না দিদি এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না। এক বাড়ীতে থেকে, ছেলে আমার এমন মন গুম্বরে বেড়ালে—ব্যাঘ্রোতে পড়বে। তার-চেয়ে আমাদের অন্ত কোন জায়গায় চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়ায়, আর আমিও দুটো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

হরিচরণ ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল।

হরি। মা সরকার জেঠামশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

সিদ্ধে। তাঁকে একটু পরে আসতে বলে দে হরি।

হরি প্রস্থানোক্ত, সিদ্ধেশ্বরী ভাকিয়া বলিলেন।

সিঁদে। হরি শোন ?

হরি কিরীয়া দাঁড়াইল।

তোরা অতুলের সঙ্গে কেউ কথা কস্‌নে কেন রে ?

হরি। ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে মা ? বড়দাকে যা মুখে আসে, তাই বলে। ছোট খুঁড়িমা-কে গালাগালি দেয় !

সিঁদে। যা হয়ে গেছে—তার আর উপায় কী হরি। যাও—ডেকে অতুলের সঙ্গে কথা কও গে।

হরি। ওর কথা কইবার লোকের অভাব হবে না মা। পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক্‌ ঢের বন্ধু-বান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জলিয়া উঠিয়া বলিলেন।

নয়ন। তোর মুখও তো নেহাৎ কম নয় হরি ? তুই আমাদের এমন কথা বলিস্‌। আচ্ছা, সেই ভালো, আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। দেখি, আবার হরলাল দড়িঝুড়ি নিয়ে এলো কিনা ? বাকী জিনিষগুলো আবার গুছিয়ে নিতে হবে তো।

হরি। অতুল সকলের হুমুখে দাঁড়িয়ে কান মল্‌বে—নাকখং দেবে—তবে আমরা কথা বলব। তা নইলে, ছোট খুঁড়িমা—না মা, সে আমরা কেউ পারবো না।

প্রস্থান

নয়ন। ছেলেদের কথা শুন্‌লে ত দিদি ! ছোট-বো যদি ছেলেদের একবার ডেকে বলে দেয়, তা হলেই তো সমস্ত গুণগোল মিটে যায়। সিঁদে। তা যায়।

নয়ন। তবেই দেখ দিদি, এই সব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে ? না ভালবাসবে ? বলা যায় কি ভবিষ্যতের কথা, তোমার

নিজের ছেলেরাই তোমার কথা শোনে না, কিন্তু আমার অতুল তোমরা যাই বলো, তার- মা অন্ত প্রাণ! আমি বলি সাধি কী তার এই হরিচরণের মতো ঘাড় নেড়ে চলে যায়?
 সিদ্ধে। তা বটে? এ বাড়ীর মণি থেকে পটল পর্যন্ত সবাই ওই শৈলর বশে। সে যা বলবে তাই করবে, আমাকে কেউ মানে না।
 নয়ন। কিন্তু এটা কী ভাল?
 সিদ্ধে। ভাল নয় তা মানি, কিন্তু করবোই বা কী?

উচ্চকণ্ঠে

ওরে ও নীলা, নীলা—

নেপথ্যে নীলা। কী মা।

সিদ্ধে। তোর ছোট খুড়িমাকে একবার ডেকে দে তো।

নয়ন। ছোটবৌকে আবার আমার এখানে ডাকছ কেন দিদি?

সিদ্ধে। আজ আমি তাকে ডেকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে চাই, সে কী চায়।

নয়ন। সে কী চায় সে তুমি জিজ্ঞাসা না করলেও, আমি বলতে পারি।

সিদ্ধে। কিন্তু তার মতেই যে সব সময় চলতে হবে তার তো কোন মানে নেই মেজবৌ। আজ তাকে আমি সোজা কথা সোজা হুজিভাবে জিজ্ঞেস করবো। দেখি কি জবাব দেয়?

শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিল

শৈল। আমার ডাকছিলে দিদি?

সিদ্ধে। হ্যাঁ। তোর কী মত, মেজবৌ এরা এখান থেকে চলে যাক?

শৈল। সে কি! মেজদি চলে যাবেন? কেন?

সিদ্ধে। না গিয়ে আর উপায় কি বল। তোর হুঁসে ছেলেরা কেউ

অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, খেলা করে না। ছেলেমানুষ তার দিনটাই বা কাটে কি করে বল? আর দিবারাত্র ছেলের শুকনো মুখ দেখে বাপ মাই বা এখানে, বাস করে কী করে? তুই তাহলে ওদের এ বাড়ীতে রাখতে চাস নে?

নয়ন। তা হলে সবদিক দিয়েই বোধহয় ছোট বোয়ের ভাল হয়।

শৈলজা। আমার আর ভালো মন্দ কী? কিন্তু ছেলেদের যে ভাল হবে না, তা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি। অমন ছেলের সঙ্গে আমি এ বাড়ীর কোন ছেলেকেই মিশতে দিতে চাইনে। ও যে কী মন্দ হয়ে গেছে তা মুখে বলা যায় না—

নয়ন। হতভাগী মায়ের মুখের সামনে অমন, করে তুই ছেলের নিশ্চয় করিস? মুখ যেন তোর খসে যায়। দূর হ—দূর হ—আমার ঘর থেকে—

শৈলজা। আমি ইচ্ছে করে কখনো তোমার ঘরে পা দিইনে মেজদি। কিন্তু এমনি করেই তুমি ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ! আজ বুঝতে পারছ না, একদিন পারবে।

প্রহান

নয়ন। শুনেছি দিদি কথাগুলো, শুনেছি তো না দিদি! আমাদের ছেড়ে দাও আমরা চলেই যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি আমাদের ছাড়তে চাইছ না। কিন্তু ছোটবোয়ের এতটুকু ইচ্ছে নয় যে আমরা এ বাড়ীতে থাকি।

সিদ্ধে। তুমি কিছু মনে করো না মেজবো। তা ওরা যা বলছে অতুল কেন তাই করুক না? সেও তো ভাল কাজ করেনি মেজবো।

নয়ন। আমি কী বলেছি যে সে ভাল কাজ করেছে? জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে কেউ কী বড় ভাইকে গালাগালি দেয়? আমি না হয় তার হয়ে তোমাদের সকলের কাছে নাক্ষৎ দিচ্ছি।

স্নানতারা মাটিতে নাকথৎ দিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বাধা দিলেন।

সিদ্ধে। ও কি মেজবোঁ! ছি ছি! ও কি করছ—

নয়ন। তাকে তোমরা মাপ কর দিদি। তার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

শৈলজার প্রবেশ

শৈলজা। সরকার ম'শায়ের বাড়ীতে বড় বিপদ, তিনি কিছু টাকা চান।

তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্ত অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

সিদ্ধে। যা ভাল হয় তোর করগে যা—আমি তার কি জানি?

শৈলজা। বারে! কী দেওয়া হবে না হবে, তুমি না বললে আমি কী করে বার করে দেব?

সিদ্ধে। যেমন করে চব্বিশ ঘণ্টা সিন্দুক খুলে টাকা বার করছি, তেমনি করে বার করে দিগে যা। তোর ওপর আমার আর এতটুকু—
 পিঁত্তিছেন্দা নেই। তোর ব্যবহারে আজকাল তোর সঙ্গে কথা
 কইতেও আমার ঘেরা হয়। আপনার জা-দেওরকে তাড়িয়ে দিয়ে
 যে তোদের নিয়ে মাথায় করে নাচব এ তুই মনেও ঠাই দিসনে।
 আমার সংসারে যদি মানিয়ে চলতে না পারিস্ যেখানে তোদের
 সুবিধে হয় চলে যা—আমি আর পারি না। পারি না।

সিদ্ধেশ্বরী কোন প্রকারে কান্না চাপিয়া বস হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলজা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরীশের বসিবার ঘর

ঘরের মধ্যস্থলে একটি সেকরেটেরিয়ারেট টেবিল পাতা। টেবিল ঘিরিয়া কয়েকখানি চেয়ার সোফা ইত্যাদি দেখা যাইতেছে। কয়েকটি আলমারী ঠাসা আইন পুস্তক। টেবিলের ওপর ইত্যন্ত ব্রীক্‌ ছড়ান। গিরীশ সবেমাত্র কোর্ট হইতে আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া চেয়ারে বসিয়া অনাবোখ সহকারে ব্রীক্‌ পাঠ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর পুরাতন সরকার গণেশ চক্রবর্তী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, গিরীশ গণেশের আসা টের পাইলেন না। কিছুক্ষণ ইত্যন্ত করিয়া গণেশ ডাকিল—

গণেশ। বাবু!

গিরীশ নিরুত্তর

বড় বাবু!

গিরীশ। (গণেশের দিকে চাহিয়া) কে? ও! গণেশ! কী খবর?

গণেশ। বাড়ীতে বড় অসুখ, দু'এক দিনের জন্তে দেশে যেতে চাই।

গিরীশ। তা বেশ তো! বড় বৌকে বলে বাও।

গণেশ। আজ্ঞে বড় মাকেই বলতে গিয়েছিলাম—

গিরীশ। বলতে গিয়েছিলে তো বললে না কেন?

গণেশ। আজ্ঞে, তিনি বড় ব্যস্ত তাই—

গিরীশ। তোমাদের এই বড় মা-টি অতিশয় ব্যস্তবাগীশ! আর সেই-

জন্তেই তো রোগ সারছে না। ডাক্তারে বলছে—ওষুধ পত্তি নিয়মিত খেতে আর চুপ চাপ শুয়ে থাকতে। তা নয়, সারাদিন ঘুরপাক খাচ্ছেন আর রোগটিকে বাড়াচ্ছেন।

গণেশ। আজ্ঞে, তা নয়। বড় মা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না, ঘরেই বসে আছেন।

গিরীশ। বসে আছেন তো বললে না কেন ?

গণেশ। আজ্ঞে বলব কী ! দেখলাম বড় গণ্ডগোল—

গিরীশ। গণ্ডগোল ! ঐ এক হয়েছে। দিনরাত্রি কেবল গণ্ডগোল আর গণ্ডগোল। আরে বাপু, গণ্ডগোলটা কিসের ? গণ্ডগোল করলেই গণ্ডগোল ! না করলেই নয়।

গণেশ। আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। কিন্তু কিছু টাকারও যে দরকার ছিল।

গিরীশ। দরকার তো হবেই। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ টাকার দরকার হবে না ? যাও যাও—বড় গিরীশ কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চলে যাও।

গণেশ অস্থানান্তর। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

গণেশকে দেখিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। তুমি কী টাকা চাইছিলে গণেশ ?

গণেশ। ইয়া মা।

সিদ্ধে। নীলার কাছে টাকা রেখে দিয়ে এসেছি। নিয়ে যাও।

গণেশের প্রস্থান

গিরীশ। আমার কাছে এসে বলে কিনা, টাকা—ছুটি, আমি ওসব কী জানি বাপু। তাই তো গণেশকে বলছিলাম ওসব সংসারের ব্যাপার—আমি কী জানি।

সিদ্ধে। কিন্তু না জানলে তো আর হবে না। এখন থেকে জানতেই হবে। এই যে আজ মেজবোঁ আর একটু হলোই চলে যাচ্ছিলো। বিছানা পত্তর বাঁধা-ছাঁদা সব ঠিক ঠাক্—

গিরীশ। সেকি ! কেন ?

সিদ্ধে। এমনিই তো মেজবোঁয়ের সঙ্গে ছোটবোঁয়ের এক ভিলার্কও বনে না। তার ওপর ছোটবোঁ বাড়ীর সব ছেলেদের শিখিয়ে দিয়েছে—

কেউ যেন অতুলের সঙ্গে কথা না কয়; সে বেচারী এই কদিনে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। শৈল যে এইভাবে এখন থেকে ভায়ে ভায়ে অসদৃশ্য করিয়ে দিচ্ছে, বড় হলে এরা তো লাঠা-লাঠি মারামারি করে বেড়াবে! এটা কি ভাল?

গিরীশ। না না, খারাপ! খুব খারাপ।

সিন্ধু। ওর জন্তেই তো সেদিন মণি—অতুলকে অমন করে ঠেঙ্গালে।

আচ্ছা সে-ও মেরেছে, ও-ও গালাগালি দিয়েছে—চুকে গেল, আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে বারণ করা?

গিরীশ। (ত্রীক্ হইতে মুখ তুলিয়া) ঠিকই তো!

সিন্ধু। আজ তুমি মণি আর হরিকে ডেকে বলো, দিও, তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথা বলে। নইলে ওরা চলে গেলে পাড়ার লোকে যে আমাদের মুখে চূণ কালী দেবে। সত্যিই তো আর ছোট বৌয়ের জন্তে মায়ের পেটের ভাই ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না।

গিরীশ। (অগ্রমনস্ক-ভাবে) তা তো নয়ই?

সিন্ধু। আর দেখ, এখন থেকে সংসারের দিকে একটু নজর দেবার চেষ্টা করো।

গিরীশ। করবো।

সিন্ধু। করবে যা, তা আমি জানি! আমার শুধু বলে মুখ নষ্ট!

গিরীশ। না না, নষ্ট হবে কেন? বল না আমি শুনছি—

সিন্ধু। এই যে ছোট ঠাকুরপো, কোন কিছু রোজগারের চেষ্টা করবে না চূপ-চাপ বসে আছে। এমনি করেই কী ওর চিরকাল চলবে?

গিরীশ। ঠিক কথা! আমি আচ্ছা করে ধমকে দেবো'খন?

সিন্ধু। ধমকে যা দেবে, তা আমার জানা আছে। তোমার ওই পর্য্যন্তই—

গিরীশ। না না, তোমার সামনেই এখনি তাকে ধমকে দিচ্ছি। ওরে কে আছিল, রমেশকে একবার ডেকে দে তো—

হরিশের প্রবেশ

হরিশ। রমেশকে ডাকছেন দাদা?

গিরীশ। হ্যা! তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একে বারে আনোয়ার হয়ে গেল!

হরিশ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে না! Idle brain is devils workshop। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কাবখানা। এও হয়েছে—
ঠিক তাই।

গিরীশ। ঠিক ঠিক।

হরিশ। আর তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় দাদা, সে আর এখন ছেলে মানুষটি নয় যে সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াবে আর খবরের কাগজ মুখে করে দেশ উদ্ধার করবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আমাকে ডাকছিলেন দাদা?

গিরীশ। হ্যা। তুই অতুলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস কেন?

রমেশ। আমি?

গিরীশ। হাঁ হাঁ, তুই—

রমেশ। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঝগড়া করেছি?

গিরীশ। হ্যা। আলবৎ করেছিস, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি মন্দ করেছিস।

রমেশ। শুনেছি বটে! কিন্তু ঝগড়ার সময় আমি ত ছিলুম না দাদা।

গিরীশ। নিশ্চয়ই ছিলি।

রমেশ। না দাদা, বিশ্বাস করুন; আমি ছিলাম না—

গিরীশ। আমি, হরিশ বাড়ীর সকলে ছুটে গেলাম, আর তুই ছিলি না?

রমেশ। বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি ছিলাম না।

গিরীশ। তবে বড় বৌ কী মিছে কথা বলছেন?

রমেশ আশ্চর্য হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মূখের দিকে চাহিলে—

সিদ্ধেশ্বরী গর্জিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। তোমার কী ভীম-রতি ধরেছে? বাগড়া ঝাঁটি যখন হয় তখন তো তুমি ছুটে গিয়েছিলে। ছোট ঠাকুরপোকে তখন তুমি দেখতে পেয়েছিলে কি? সে কি ছিল সেখানে?

গিরীশ। না, তা তো ছিল না বলেই, মনে হচ্ছে বটে—

সিদ্ধে। তবে? কখন তোমাকে বললাম ছোট ঠাকুরপো অতুলকে গালাগালি দিয়েছে?

গিরীশ। ও! না না, সে বুঝি ছোট বৌমা? তা ছোট বৌমাই বা কেন গালাগালি করবেন শুনি?

সিদ্ধে। (সক্রোধে) সে করে নি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলবো আমি। তুমি তার জন্তে ছোট ঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্ছ কেন?

গিরীশ। আচ্ছা তাই যেন হলো। (রমেশের প্রতি) কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে আমার চার চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি! আর দেখগে যা—বাগবাজারের খাঁ-দেব এই খড়ের দালালীতে তারা ক্রোড়-পতি হয়ে গেল।

হরিশ। খড়ের দালালী?

গিরীশ। হ্যা, খড়ের দালালী।

রমেশ। না দাদা, খড়ের নয়—পাটের।

গিরীশ। তারা আমার মকেল আর আমি জানি নে তুমি জান।
খড়ের দালালী করেই তারা বড়লোক হয়েছে। জাহাজ জাহাজ
খড় বিলেত পাঠাচ্ছে—

রমেশ। আমি যতদূর জানি, খড় নয় দাদা, ওটা পাট।

গিরীশ। আচ্ছা না হয় পাটই হ'লো? এই পাটের দালালী করে তুই
কি হু'শো একশও আনতে পারিস্ নে। তোমাদের তো আমি
চিরকাল বসে বসে খাওয়াতে পারবো না। 'যে মাটিতে পড়ে লোক
ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার টাকা লোকসান গেছে, থাক্
কুছ্ পরোয়া নেই। আচ্ছা আর চার হাজার নাও, না হয় আরও
চার হাজার নাও। তাই বলে আমি ব্যাটা খেটে মরবো, আর
তুমি যে বসে বসে খাবে? তা হবে না।

হরিশ। পাটের দালালী তো আর করলেই হয় না, শিখতে হয়, বার
বার এইভাবে টাকা নষ্ট করে আর লাভ কী দাদা!

গিরীশ। তা ঠিক বটে। আমি পাটের দালালী-দালালী বুঝিনে,
তোমাকে খড়ের দালালীই কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে
আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেবো, চার হাজার
টাকার খড় কিনবে আর চার হাজার টাকা জমা রাখবে। এই
টাকাটা নষ্ট হলে—তবে ঐ জমার টাকায় হাত দেবে। তার আগে
নয়। বুঝলে!

রমেশ। (ঘাড় নাড়িয়া) যে আজ্ঞে।

গিরীশ। যাও।

রমেশের প্রস্থান

হরিশ। এই আট হাজার টাকাটা দেওয়া কী ঠিক হলো দাদা?

গিরীশ। কেন নয়? না দিলে কুঁড়ের মতো বসে থাকবে যে।

হরিশ। কিন্তু এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কী বল বোঠান? এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার ব্যবসা করবার জন্য টাকা দিতে যাচ্ছেন?

গিরীশ। তা হলে তুমি কী করতে বল?

হরিশ। রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কী? আট হাজারই দিন্ আর আট লাখই দিন্ আটটা পয়সাও যে ও ফিরিয়ে আনতে পারবে না, এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি।

গিরীশ। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেছে হরিশ। একে টাকা দেওয়া মানেই ত জলে ফেলে দেওয়া। ও আবার কী একটা মাছ?

হরিশ। তার চেয়ে আমি বলি কী রমেশ বরং একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করুক। খুড়তুতো ভাই হিসাবে আমাদের যা করা উচিত ছিল—আমরা তা করেছি, এখন গুর যেমন ক্ষমতা তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়ানোর জন্যে মাসে মাসে আমাদের পঁচিশ টাকা করে দিতে হচ্ছে। সে কাজটাও তো গুর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও ত ও আমাদের কতকটা সাহায্য করতে পারে, কী বলো বোঠান?

গিরীশ। ঠিক ঠিক। ঠিক কথা বলেছে হরিশ, কাঠ বেড়ালী দিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধে ছিলেন, দেখছ বড়বোঁ—হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেছি কিনা ছেলেবেলা থেকেই গুর বুদ্ধিটা ভারি প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যতটা ভেবে দেখতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। আমি তো আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে কেলেঙ্কারি আর কী! কাল থেকে রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ

করে দিক, খবরের কাগজ মুখে নিয়ে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

সিদ্ধে। টাকাটা কী তবে দেবে না না-কি ?

গিরীশ। নিশ্চয়ই না। তুমি বল কী, আবার আমি তাকে টাকা দিই কখনো ?

সিদ্ধে। তা হলে এইভাবে তাকে আশা দেওয়া ঠিক হয় নি।

হরিশ। বললেই যে দিতে হবে, তার তো কোন মানে নেই বোঠান !

আমিও তো দাদার সহোদর, আমারও তো একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারের টাকা নষ্ট হলে আমারও তো গায়ে লাগে—

সিদ্ধেশ্বরী স্নান হাসিয়া

সিদ্ধে। তা বুঝেছি ; ওইটাই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো !

শৈলজার শয়ন কক্ষ

ঘরের মধ্যস্থলে খাটপাতা, একপাশে আলমারী অপরদিকে জানুলা এবং সাংসারিক জিনিষপত্রের দেখা বাইতেছে। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা, উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

খাটের ওপর রমেশ চুপচাপ বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শৈল। ই্যা গা ! বড়ঠাকুর তখন তোমায় ডাকছিলেন কেন ?

রমেশ। এমনি !

শৈল। ও ! অনেক দিন বুঝি দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তাই দেখেই বিদেয় দিলেন।

রমেশ। না না, কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও ছিল।

শৈল। সেই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা কী তাই তো জানতে চাইছি ?

রমেশ। ব্যবসাটা আবার চালু করার জন্তে দাদা আরো হাজার আস্টেক টাকা দিতে চান। তা দাদাকে তো জানো—কোন কথাই তাঁর মনে থাকে না। সেবার টাকা দিলেন—পাটের ব্যবসা করার জন্তে ; এখন বলছেন—খড়ের।

শৈল। তা পাটকে খড় বলেই মেনে নিয়ে এলে তো ?

রমেশ। তা নিয়ে এলাম বৈ কি। ঐ নিয়ে তো আর দাদার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না।

শৈল। তা বেশ করেছে। কী ঠিক করলে ? ব্যবসাই করবে ?

রমেশ। তা ছাড়া আর উপায় কী ? দাদা যখন বলছেন।

শৈল। কিন্তু আমি বলি কী, টাকা নিয়ে ব্যবসা না করে, একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে নেবার চেষ্টা কর।

রমেশ। কিন্তু চাকরী করায় দাদা কী মত দেবেন—

শৈল। সরাসরি মত দেবেন কিনা জানি না। তবে চাকরী যদি তুমি জুটিয়ে নিতে পার, তা হলে অমত করবেন বলেও আমার মনে হয় না।

রমেশ। কেন ? ব্যবসা করার তোমার আপত্তি কী ?

শৈল। ব্যবসা করার আমার আপত্তি নয়—বড় ঠাকুরের কাছে টাকা নেওয়াতেই আমার আপত্তি। মেজদি, মেজ বড়ঠাকুর যখন এখানে ছিলেন না তখন বড়ঠাকুর বা দিয়েছেন, নিয়েছেন। কিন্তু আজকে তৃতীয় পক্ষ যখন উপস্থিত, তখন দাতা বা গ্রহীতা কারুরই দেওয়া বা নেওয়া উচিত নয়।

রমেশ। কিন্তু আমি তো চাই নি, দাদা ইচ্ছে করেই তো দিচ্ছেন।

শৈল। বড়ঠাকুর শিবতুল্য মানুষ! তাঁর তুলনা হয় না, তিনি চান সকলে
স্বখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। কিন্তু তিনি দিতে চাইলেও তোমার তা
নেওয়া উচিত হবে না। বড়ঠাকুর যে টাকা দিতে চাইছেন, সে
টাকা এখন আর তাঁর একার নয়, ওতে মেজ বড়ঠাকুরেরও ভাগ
আছে। দিদি তো আজ স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞাতি-সম্পর্ক
ছাড়া তোমার সঙ্গে তাঁদের আর কোন সম্পর্কই নেই। তুলে যেও
না—তুমি তাঁদের খুড়তুতো ভাই।

রমেশ। এতদিন পরে আজ একথা উঠছে কেন শৈল?

শৈল। এতদিন বুঝতে পারিনি, দিদি আমার আপনার জা নন, আর
বড়ঠাকুর তোমার, আপনার ভাই নন। দিদি আজ এই কথাটা
বিশেষ করে জানিয়ে দিয়েছেন বলেই তোমাকে বললাম।

রমেশ। বড় বৌ!

শৈল। হ্যাঁ। দিদি আজ আমাকে সোজাসৃজি বলেন—আপনার
জা দেওরকে পর করে দিয়ে যে তোমাদের মাথায় নিয়ে নাচব তা
মনেও করো না—

রমেশ। ও বড় বৌ রাগের মাথায় কী বলেছেন, ও কথা ধরতে গেলে
কী চলে? আর তোমাদের খুটমুট তো লেগেই আছে।

শৈল। আমাদের খুটমুট লেগে আছে, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু তার
মধ্যে কোনদিন সম্পর্কের ব্যবধান দেখা দেয়নি।

নীলার প্রবেশ

নীলা। ছোটখুড়িমা, অতুল আমার ডেকে কী বলছে জান?

শৈল। কী বলছে রে?

নীলা। বলছে—ছোটকাকাকে আমার পড়াতে হবে। আমার

মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর মাষ্টারকে যে পচিশ টাকা করে মাইনে দেওয়া হতো, সেই টাকাটা দেওয়া হবে—ছোটকাকাকে।

আমার শুনে এমন রাগ হলো।

শৈল। এতে রাগ করবার কী আছে নীলা? মাষ্টারী সে তো ভাল কাজ।

নীলা। ভাল না ছাই। ছোটকাকা শুধু শুধু ওর মাষ্টারী করতে যাবেন কেন? ছোটকাকা কী মাষ্টার? সে আরো যে সব কথা বলেছে,—সে আর তোমায় কী বলবো?

রমেশ। অতুল আর কী বলেছে নীলা?

নীলা। সে ভারি খারাপ কথা ছোটকাকা, এবার থেকে ওর সঙ্গে আমরা কেউ কথা বলবো না।

শৈল। ছিঃ! ও কথা কি বলতে আছে মা?

নীলা। না বলতে নেই বৈ কি? ও কেন, ও সব কথা বলবে?

শৈল। কী কথা বলেছে নীলা?

নীলা। বলে কী ঐ মাইনের পচিশ টাকাও ছোটকাকার হাতে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে মার হাতে, সংসার খরচের জন্তে। এর পরেও তার সঙ্গে তোমরা কথা বলতে বলা—এরকম কথা যে বলে, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলবো না—কিছুতেই না—

এহান

শৈল। শুনলে?

রমেশ। শুনলাম। কিন্তু করব কি? এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারব না।

শৈল। ঝগড়া করতে আমিও তোমায় বলি না। আমি বলি, এমন একটা উপায় কর, যাতে আমরা এই ঝগড়াকে এড়িয়ে চলতে পারি।

রমেশ। সেই উপায়ই আমি করব শৈল।

শৈল। আমি জানি তুমি করবে, আর সেই-জন্তেই আমি তোমায়
বটঠাকুরের কাছে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে বারণ করেছিলাম।

রমেশ। তখন বুঝতে পারিনি শৈল। তখন ভেবেছিলাম বোঠানের
ওপর অভিমান করেই তুমি বলছ। কিন্তু এখন দেখছি—এ তা
নয়—এ পাকা ইমারতে ফাটল ধরেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

বাটার অন্দরমহল। রান্নাঘরের সম্মুখস্থ দালান

নীলা দালানে বসিয়া গান গাহিতেছে, পাশে সিক্তেশ্বরী। রান্নাঘরের মধ্যে শৈলজা

রান্নার কাজে ব্যস্ত। তখন বেলা ১০টা—১১টা।

নীলার গান

কে যাবে মধুরাপুর, কার লাগি রব।

এসব ছুথের কথা লিখিয়া পাঠাব ॥

হাত কলম করি, নয়ন করি দোত।

কলিজা কাগজ করি লিখি চাঁদ মুখ ॥

কেহ ত না কেহ রে আশুব তোর পিরা।

কতনা রাখিব চিত্ত নিবারণ দিরা ॥

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারার প্রবেশ করিলেন

নয়ন। এ কি দিদি! এমন করে বসে আছ যে? শরীর কী আজ

বড্ড বেশী খারাপ মনে হচ্ছে? ডাক্তারকে খবর দেবো?

সিকে। না না। কিছু হয়নি, আমি আজ ভালই আছি।

নয়ন। তোমার কথা তো ? দেখি, কেমন ভাল আছ ?

কপালে হাত দিরা

সিদ্ধে। নিত্য নিত্য কি আর দেখবি মেজবো। সত্যিই বলছি—
আজ আমার জ্বর হয়নি।

নয়ন। তা অমন করে বসে আছো কেন দিদি ? বেলা হলো—যা হোক
চারটি মুখে দেবে চলো।

সিদ্ধে। বেলা আর কোথায় মেজবো, এই ত সব এগারোটো।

নয়ন। এগারোটো কী সোজা কথা দিদি ! তোমার অস্থখ শরীরে
যে বেলা নটার ভেতরই খাওয়া-দরকার।

সিদ্ধে। তা হোক মেজবো, আমি কোনদিনই এত শীগ্গির খাই না।

নয়ন। এই জন্তেই তো পিত্তি পড়ে শরীরের এই অবস্থা ! আমার
হাতে হৈসেলু থাকলে আমি কি ন-টা পেরোতে দিই ? তুমি না
বাঁচলে কার আর কী ? আমাদেরই সর্বনাশ !

সিদ্ধে। তুমি আপনার জন বলেই আজ এ কথাটা বললে মেজবো !
নইলে আমার আর কে আছে ?

নয়ন। না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে তুমি যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে
পালাবে তা হবে না।

শৈলজা খুন্সি হাতে রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া কহিল।

শৈল। এখন কী খেতে দেবো ?

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না, নয়নভারা বলিয়া চলিলেন।

নয়ন। ওঁরা যেমন ছুটিতে সহোদর, তেমনই আমরাও তো ছুটি বোন।

যেখানে যত দূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যেমন নাড়ীর টানে
কঁদে মরবো, আর কী কেউ তেমন করে কঁাদবে ?

নীলা বিরক্তভাবে

নীলা। আঃ! উত্তর দাও না মা, ছোটখুড়িমা যে জিজ্ঞেস করছেন,
তুমি এখন থাকে না, না?
সিন্ধে। (বিরক্তভাবে) আহা! মেয়ের মুখ দেখ না, বলছি তো
এখন থাকে না।

শৈলজা রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

নয়ন। এই যে তুমি বললে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর সত্যিকারের
কেউ আপনার জন নেই এ কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেয়ো না।
সিন্ধে। একি ভুলবার কথা মেজবোঁ! এতদিন তোমাকে চিন্তে
পারিনি তাই।

নয়ন। দোষ আমার দিদি! আমিই তোমাকে চিনিনি। আজ যদিই বা
জানতে পারলুম, আমরা তোমার পায়ে ধুলোর যোগ্য নই।
কিন্তু সে কথা জানানো কী করে দিদি, তোমার কাছে থেকে
তোমার সেবা করবো ভগবান তো সেদিন দিলেন না। আমরা
'হয়েছি ছোটবোঁয়ের হুচোকে'র বিষ।

সিন্ধে। অত যদি তার চক্ষুশূল হয়ে থাকে, তা হলে সে যেন তার
ছেলেপুলে নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে যায়। আমি তার সাত
শুটিকে দুখে ভাতে খাওয়ানো কি নিজের সর্বনাশ করার জন্তে?

শৈলজা ইতিমধ্যে রান্নাঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। সিন্ধেশ্বরী
বা নয়নভারা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। নীলার কিন্তু চোখ
এড়াইল না। সে মায়ের কথা চাপা মেওয়ার ঢেঁটা করিতে
লাগিল। সিন্ধেশ্বরী যথারীতি বলিয়া চলিলেন।

সিন্ধে। খুড় তুতো! ভাই ভাজ! তাদের ছেলেপুলে—এই তো সম্পর্ক!

ডের খাইয়েছি, ডের পরিয়েছি—আর না, দাসী চাকরের মতো মুখ
বুঁজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক্, না হয় চলে যাক্।

নীলা। মা কী বক্ছো পাগলের মতো! আঃ! চূপ করো না।

শৈলজা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সিন্ধে। আমরা দু-জায়ে কথা বলছি তা তোর কী লা! তুই চূপ করে
থাক্। ছোট মুখে বড় কথা!

নয়ন। ওদের আর দোষ কী দিদি, যেমন দেখছে তেমনি শিখবে তো?
কথায় কথায় অনেক বেলা হল; এইবার খাবার সময় হয়েছে, আমি
তোমার খাবার জায়গা করে দিয়ে আসি, আর বেলা করো
না লক্ষ্মীটি!

নয়নভারার প্রস্থান.

সিন্ধেওরী আপন মনে বলিতে লাগিলেন।

সিন্ধে। ই্যা। আপনার জন বটে মেজবোঁ! সে না থাকলে দেখছি
এবার আমাকে বে-ঘোরে মরতে হতো। এমনি সেবায়ত্ত আমার
মায়ের পেটের বোন থাকলেও করতে পারতো না। আর অপরকে
খাওয়ানো পরানো—শুধু অধর্মের ভোগ; ভস্মে ঘি ঢালা! মেজবোঁকে
আমার মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে!
আমার এমন গোড়া কপাল! যে এমন মানুষকে আমি পবের
ভাঙ্চিতে পর মনে করেছিলুম। মার কাছ থেকে কদিন হোল
একখানা চিঠি এসেছে—তা যে কাউকে দিয়ে একটু পড়িয়ে শুনবো,
আমার সে উপায়ও নেই। অপরকে খাওয়ানো পরানো তবে
কিসের জন্তে?

নীলা। মেজখুড়িমা সে চিঠিটা তোমাকে দু'তিনবার পড়ে শুনালেন
যে মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল?

সিদ্ধে। তুই সব-কথায় গিন্নিগণা করতে বাসনে নীলা! চিঠি শুনলেই হলো, তার জবাব দিতে হবে না? কেন? তোরা ছোটখুড়ি কী মরেছে—যে পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাবো?

নীলা। চিঠি লেখাবার আর কী কেউ নেই মা যে, এই আজ সংক্রান্তির দিনে তুমি আমার ছোটখুড়িমাকে মরিয়ে দিচ্ছ?

সিদ্ধে। তুই যে আমায় অবাক করলি নীলা! বালাই যাট! মরবার কথা আবার আমি কখন বল্লুম? (কাঁদিয়া) পেটের মেয়ে সেও আমাকে মুখ নাড়া দেয়? কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলে গিঠে করে মাছুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না! আমার সঙ্গে কথা কয় না। এত যে আমি রোগে ভুগছি তবু তো আমার মরণ হয় না? আজ থেকে আমি যদি এক ফোটা ওষুধ খাই তো আমার অতি বড়—দিব্যি।

সহসা নরনতারার প্রবেশ

নয়ন। কেন শুধু শুধু দিব্যি-বিপাস্তর করতে যাচ্ছ দিদি? একখানা চিঠির জবাব লেখাবার জন্তে অত খোসামোদ করা কেন? আমাকে হুকুম করলে এতকণে অমন দশখানা চিঠির জবাব লিখে দিতে পারতুম। এস—খাবে এস।

নরনতারার জোর করিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে টানিয়া লইয়া গেল। অপর দিক হইতে
শৈলজাকে লইয়া নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

নীলা। মার কথায় তুমি কিছু মনে ক'রোনা ছোটখুড়িমা, অস্থখে ভুগে ভুগে মা যেন কী রকম হয়ে গেছেন। আর তার ওপরে মেজ খুড়ীমা অষ্টপ্রহর খিটু খিটু করছেন। ওরা না এলে ভালই হতো—

শৈল। ও কথা কি বলতে আছে মা? নিজেকে বাড়ী-ঘর আসবেন বৈকি!

নীলা। তা আসুন না। তার-জগ্গে ত কিছু বলছি না। কিন্তু তোমাকে অমন ক'রে বলবেন কেন?

শৈল। তা বলেনইবা। ওঁরা বড়, ওঁরা যদি কিছু বলেন, তাতে কি রাগ করতে আছে?

নীলা। বড় বলে যা তা বলবেন—না? আমি কিন্তু মেজ খুড়ীমাকে এবার একদিন আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

শৈল। ছি-মা! ও কথা কি বলতে আছে?

নীলা। না, বলতে নেই বৈকি, ওরকম—লোককে বলে, কিছু দোষ হয়না। দেখছেন মার ঐ রকম অস্থখ, আজ ক'মাস ধরে ভুগছেন, আর উনি কেবল এটা ওটা লাগিয়ে মার মন ভাঙিয়ে দিচ্ছেন।

শৈল। তা দিন না। দিদির কথায় আমি কিছু মনে করি না।

ব্যস্তভাবে রমেশ প্রবেশ করিল

কি গো! ফিরে এলে যে?

রমেশ। আর বল কেন? যে ভুলো মন! নীলা, চট্ট ক'রে একবার ওপরে যা ত মা! আমার ঘরে খাটের ওপর একটা লম্বা খাম আছে সেটা নিয়ে আর ত—

নীলার প্রস্থান

শৈল। মা মঙ্গলচণ্ডী যদি মুখ ভুলে চান, তবেই এ অপমানের হাত থেকে হস্ত আমরা রক্ষে পাব।

রমেশ। চাকরী পাই আর না পাই, আমার কী মনে হয় জান শৈল? এখন এখান থেকে দিনকতক আমাদের চলে যাওয়াই ভাল।

শৈল। তা কি হয়? দিদির অস্থখ, তাঁকে কেলে আমাদের কি যাওয়া উচিত?

রমেশ। বোঠানকে দেখবার ত এখন লোক হয়েছে।

শৈল। কিন্তু মেজদিদির ওপর তার দিয়ে আমি কী করে নিশ্চিত হয়ে থাকি বল?

রমেশ। না থাকতে পারলে, ছেলেদের পড়ানোর কাজটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে নিতে হবে। মেজবৌ মাস কাবারে ২৫ টাকা মাইনে আমাব হাতে দেবেন, আর আমি ঠাকুর, চাকর, সরকারের মত হাত পেতে তা নেব, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে।

শৈল। অদৃষ্টে যদি তা থাকে, দেখতে হবে বৈকি!

রমেশ। ছোট কাজই যদি করতে হয়, আপনার লোকের কাছে করতে পাববো না শৈল!

শৈল। যত কষ্ট, যত দুঃখই হোক—আমিও তোমায় তা করতে দেব না।

রমেশ। এ চাকরীটা জ্যোটে ভাল, নইলে তোমাদের নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে যাব।

শৈল। তা না হয় গেলে। কিন্তু খাওয়াবে কী? চালাবে কি ক'রে?

ইতিমধ্যে নীলা খামটি আনিয়া দিল।

নীলা। এই নাও কাকা। (খামটি রমেশের হাতে দিয়া) এতে কী আছে?

রমেশ। সার্টিফিকেট।

নীলা। ও! পাশ করলে যা দেয়?

রমেশ। ই্যা। কিন্তু ক'রে খাওয়ার পক্ষে এ গুলোই বথেষ্ট নয়।

নীলা। তবে লোকে পাশ করে কেন? রোজগার করবার জন্তেই ত?

রমেশ। না, মা! রোজগারের জন্তে পাশ করা নয়—মাহুষ হওয়ার
জন্তে লেখাপড়া শেখা—পাশ করা। ঠিক তোমার বাবার মতন
সদাশিব মাহুষটী হওয়ার জন্তে পাশ করা!
নীলা। (সবিস্ময়ে) ও!

পঞ্চম দৃশ্য

সিক্কেবরীর শয়ন কক্ষ

সিক্কেবরী ঘরে বসিয়া আছেন। নয়নতারা সিক্কেবরীর সেবার কার্যে
নিযুক্ত। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে।

নয়ন। ছেলেদের পড়ানোর কথা শুনে, ছোটবাবুর নাকি খুব রাগ
হয়েছে। তেজ করে নাকি বলেছেন—ছেলেগুলের হাত ধরে গাছ-
তলায় গিয়ে দাঁড়াব—তবু পঁচিশটা টাকার জন্তে* মেজদার কাছে
হাত পাত্তে পারবো না। বলি, তেজ করে ত বলি, কিন্তু এতদিন
কার খেলি? কায় পল্লি? বাপ-মা ত অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিল।
বলি, দাদারা না থাকলে কে তোকে মাহুষ ক'রতো শুনি?

সিক্কে। ওসব কথা বাদ দাও মেজবৌ। দশ বছরের মেয়ে—যাকে এনে
মাহুষ করলুম, সংসার চেনালুম, সে আজ ক'দিন আমার সঙ্গে কথা
কয় নি। বলি, আমি ত বড়, আমি যদি একটা কথা বলেই থাকি,
তাই বলে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করবি?

নীলার প্রবেশ

নীলা। আমায় ডাকছিলে মা?

সিক্কে। হাঁ। কোথায় ছিলি এতক্ষণ শুনি?

নীলা। ছোট খুড়ীমার কাছে।

সিন্ধে। ছোট খুড়ীমার কাছে তোরা এত কী-লা! যে একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস্ না? বসে থাক পোড়ারমুখী, চুপ ক'রে এইখানে।

নয়ন। ছিঃ মা! বড় হয়েছে, দুদিন পরে খন্ডর ঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও, বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভাল কথা শিখে নেবে, এখন কি আর—যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত?

নীলা। বাড়ীর মধ্যে যার-তার সঙ্গে সারাদিন আবার কখন কাটাই মেজ খুড়ীমা? তুমি কি ছোট খুড়ীমার কথা বলছ?

নয়ন। আমি কারুর কথাই বলিনি নীলা, আমি শুধু বলছি, তোমার রোগা মায়ের সেবা যত্ন করা উচিত।

সিন্ধে। সেবা যত্ন করবে? বরঞ্চ আমি মলেই ওয়া বাঁচে।

নয়নতারা। এরা না হয় ছেলেমানুষ দিদি, জ্ঞান বুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোট বোঁ ত ছেলেমানুষ নয়, তার ত বলা উচিত, যা নীলা—তোরা মায়ের কাছে হু'মিনিট বসগে যা, না সে নিজে একবার আসবে, না মেয়েটাকে আসতে দেবে?

সিন্ধে। তোমাকে সত্যি বলছি মেজবোঁ, আমার এক এক সময় এমন ইচ্ছে হয়, যে শৈলর আর মুখ দেখে বা না—

নয়ন। অমন কথা বলোনা দিদি, হাজার হোক, সে সকলের ছোট, তুমি রাগ করলে, তাদের যে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। ই্যা—ভাল কথা, কথায় কথায় ভুলেই গেছি, এ মাসে উনি পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন তার খুচরো ক'টা টাকা নিজের হাতে রেখে, বাকী টাকাটা তোমাকে দিতে বললেন।

নয়নতারা আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী সবিষ্ময়ে টাকা হাতে লইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। টাকা! কিসের টাকা মেজবো?

নয়ন। ওই যে বললুম, তোমার দেওর কাল পেয়েছিলেন, তাই বললেন—এটা বড়বৌকে দিয়ে এসো।

সিদ্ধে। নীলা, চট করে যা তো মা! তোর ছোট খুড়িমাকে একবার ডেকে দেতো, এ টাকা-গুলো তুলে রাখুক।

ব্যস্তভাবে নীলার শ্রবান

নয়ন! এখন থেকে নিজে একটু শক্ত হওয়ার চেষ্টা করো দিদি, টাকা পয়সা নিজের হাতেই রাখবার চেষ্টা কর; ও জিনিষটা এতই খারাপ যে পরকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। আমাদের পাড়ার ঐ ষড় বাবু গোপাল বাবু, হারাণ সরকার কেউতো আমাদের বড়ঠাকুরের অর্ধেকও রোজগার করে না। তবুও তাদের কারুর ব্যাঙ্কে লাখ-টাকার কম জমা নেই, আর তাদের বৌয়েদের হাতেও দশ বিশ হাজার জমেছে।

সিদ্ধে। (সবিষ্ময়ে) তুমি কি করে জানলে মেজবো!

নয়ন। তোমার দেওর যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তারা সব তোমার দেওরের বন্ধু কিনা? তাই ত কাল গোপাল বাবুর দ্বী আমার কথা শুনে তো বিশ্বাসই করলেন না। বললেন—এ কি আবার একটা কথা হলো মেজবো? তোমার ভাগুর অত টাকা রোজগার করেন, আর তোমার দিদির হাতে টাকা নেই!

সিদ্ধে। আলমারী—বাক্স—পেট্রা—সিন্দুক খুলে তুমি দেখতে পার মেজবো, সংসার খরচের টাকা ছাড়া—কোথাও যদি একটা বাড়তি পয়সা থাকে। যা করবে সে ত ঐ ছোটবো।

শৈলর প্রবেশ

শৈল। আমার ডাকছিলে দিদি ?

সিদ্ধে। হ্যাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈকি ! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, তোর ছোট খুড়িমাকে ডেকে দে, টাকাগুলো তুলে রাখুক ! এই নে—

সিদ্ধেশ্বরী বালিশ বিছানার তলা হইতে অনেকগুলি মোট খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পরে সেই টাকার সহিত নয়নতারার দেওয়া টাকা শৈলজাকে দিলেন। শৈলজা আলমারী খুলিয়া টাকা রাখিল। নয়নতারা লুক্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল।

নয়ন। কাল তোমার দেওর বলছিলেন যে, জেষ্ঠ্যুতো খুড়তুতো ভাইতো নয়—মাম্বের পেটের ভাই, তার খাবনা পরবো না তো যাবো কোথায় ? তবু মাসে মাসে যদি এমনি করে অন্ততঃ চারশো পাঁচশো টাকাও দাদাকে সাহায্য করতে পারি ; তো অনেক উপকার। তাই তো উনি বলছিলেন—বোঁঠান্ মুখ ফুটে যেন কারুর কাছে কিছু চান না, তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না ? যার যেমন শক্তি, কাজ ক'রে তাঁকে সাহায্য করা উচিত। নইলে বসে বসে গুপ্তিগুপ্তু কেবল খাব আর ঘুমোব, তা করলে কী চলে ? তোমারও তো দিদি, হরি মণির জন্তে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই। সর্বশ্রম এমনি করে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে ত চলবে না। সত্যি করে বল দিদি, ঠিক কী না !

সিদ্ধে। তা সত্যি বৈ কি।

শৈলজা ইতিমধ্যে আঁচল হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের কাছে রাখিয়া

দিয়া চলিয়া বাইতেছিলেন : সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া কোনরকমে

আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। এটা কী হলো ছোট বো?

শৈলজা কিরিয়া কহিল।

শৈল। পরের টাকার হিসেব রাখার মত বিত্তে বুদ্ধি আমার নেই দিদি, তাই কদিন ধরেই ভেবে দেখছিলুম, এ চাবি আর আমার কাছে রাখা ঠিক হবে না। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে। মতিভ্রম হতে কতক্ষণ? কী বল মেজদি?

নয়ন। আমি তো তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবো! আমাকে আর মিছে জড়াও কেন?

সিদ্ধে। মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন? শুনতে পাই কী?

শৈল। একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, 'তারও তো কোন মানে নেই দিদি। এমনিই তো তোমাদের শুধু খাচ্ছি পরছি—না পারি, গতর দিয়ে সাহায্য করতে—না পারি, পরসা দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কী চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধে। এতো ভাল কবে থেকে হলি লা? এতো ভাল মন্দের বিচার—এদিন তোর ছিল কোথায়?

শৈল। কেন শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে শরীর খারাপ করুছ দিদি। তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগছে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগছে না।

নয়ন। দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে কিন্তু তোমার ভাল লাগছে না কেন ছোটবো?

শৈলজা জবাব না দিয়া চলিয়া বাইতেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। বলে যা গোড়ারমুখী, কবে বিদেশে হবি? আমি হরির লুট দেবো। আমার সোনার সংসার—ঝগড়া বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে বুড়িয়ে দিলি? মেজবো কী সাথে বলে যে কোমরের জোর না

থাকলে মানুষের এত জোর হয় না? কত টাকা—ওরে! কত টাকা
তুই আমার চুরি করেছিস—তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈলজা কিরিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যথায় কাঁটরা পড়িয়া বলিল।

শৈল। হিসেব দিতে বলো না দিদি—হিসেব দিতে বলো না—আমার
সব হিসেব ভুল, আমার সব হিসেব ভুল!

কাদিতে কাদিতে গ্রহান

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে কাদিতে কাদিতে বলিলেন।

সিদ্ধে। হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবো, সে
আমাকে এমনি অপমান করে চলে গেল! কর্তারা বাড়ী আসুন,
ওকে যদি আজ আমি উঠানের মধ্যে জ্বাঙ্গ না পুঁতি—তবে আমার
নাম সিদ্ধেশ্বরীই নয়—

ষষ্ঠ দৃশ্য

গিরীশের বসিবার ঘর

তখন রাত্রি ৯টা। গিরীশ মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মনোনিবেশ সহকারে
পড়িতেছিলেন, এমন সময় হরলাল প্রবেশ করিল।

হরলাল। বাবু, শুনেছেন?

গিরীশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। কাজের সময় বিরক্ত করিস্ নি। বড়মার
কাছে যা—

হরলাল। আজ্ঞে বড়মার কাছে গিয়ে ত কিছু হবে না, আপনি যদি—

গিরীশ। তা আমি কি করব? আমার দ্বারায়ণ কিছু হবে না।
আমি ও সংসারের ব্যাপারে নেই—

হরলাল। কিন্তু আপনি একটু নজর না দিলে যে সংসারটা ভেঙে যায়
বাবু—

গিরীশ। ছোট বোমাকে বলগে যা, তিনি সব জোড়া লাগিয়ে দেবেন।

হরলাল। আজ্ঞে ছোট বোমাকে ত অনেক করে বললাম, তিনি
কিছুতেই যে রাজী হচ্ছেন না।

গিরীশ। তা' হলে আমি আর কী করব ?

হরলাল। আপনি যদি অহুমতি করেন, তা' হলে না হয়, আমিই ঈশ্বরের
সঙ্গে যাই।

গিরীশ। (বিরক্তভাবে) যাবে না ত কী ? আল্‌বৎ যাবে। দেখতে
পাচ্ছ না যে আমি কাজ করছি।

হরলাল দুঃখিত মনে চলিয়া গেল। গিরীশ পুররায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

অপর দিক দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল।

রমেশ। দাদা !

গিরীশ। কে ?—রমেশ ! কী খবর—

রমেশ। আপনার কাছে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

গিরীশ। (কাজ করিতে করিতে) বলো।

রমেশ। আমি ভাবছিলাম কি, যে আমি না হয় দিনকতক দেশের
বাড়ীতে গিয়েই থাকি।

গিরীশ। কেন ? ম্যালেরিয়া জ্বর আর পেট জোড়া শিলে আনবার
অস্তে ?

রমেশ। দেশে ত অনেকেই রয়েছে দাদা, সাবধানে থাকলে ম্যালেরিয়া
হবে কেন ?

গিরীশ। না হ'লে থাকতে পার।

রমেশ। বাড়ীতে না থাকলে এরপর ঘর-দোরগুলো পড়ে যেতে পারে, আর জমিজায়গাগুলোও নয়ছয় হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমারও ত এখানে এখন কোন কাজ নেই, তাই ভাবছিলাম—
গিরীশ। তা বেশ তো, মণিরুও কলেজ এখন বন্ধ রয়েছে, সে যদি যেতে চায়, ত তাকেও নিয়ে যেতে পার।

রমেশ। আচ্ছা দাদা। (রমেশ চলিয়া যাইতেছিল)

গিরীশ। আর দেখ, হরলালকেও সঙ্গে নাও। কখন কী দরকার হয় তা বলা যায় না ত।

রমেশ। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

গিরীশ পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

সিক্বেসরী প্রবেশ করিলেন

সিক্বেসরী। ওগো শুন্ছ?—

গিরীশ নিরন্তর।

বলি শুন্তে পাচ্ছ?

গিরীশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও জরুরী কাজটা আগে সেরে নিই।

সিক্বেসরী। তোমার কাজকর্ম করে লাভটা কী—আমায় বলতে পার? কেবল শূন্যের পালগুলোকে খাওয়াবার জন্তেই কি দিবারাত্র খেটে মরবে?

গিরীশ। (কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া) না, আর দেবী নেই—
এইটুকু দেখে নিয়েই—চল খেতে যাচ্ছি।

সিক্বেসরী। খাওয়ার কথা কে তোমাকে বলছে? আমি বলছি ছোট বোঁরা যে বেশ শুছিয়ে নিয়ে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার

মতলব করেছে। এতদিন যে তাদের এত করলে, একদিনেই কি সব মিছে হয়ে গেল! সে খবর শুনেছো কি?

গিরীশ। ই্যা, ই্যা, শুনেছি বৈকি। ছোট বোঁমাকে বেশ ভাল করে গুছিয়ে নিতে বল। কখন কি দরকার হয় বলা যায় না! হরলালকেও ওদের সঙ্গে দাও। আর মণি যদি যেতে চায়—
সিন্ধেশ্বরী। বলি, আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুলতে নেই? আমি কি বলছি আর তুমি কি জবাব দিচ্ছ? ছোট বোঁরা যে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে।

গিরীশ। কোথায় যাচ্ছেন?

সিন্ধেশ্বরী। কোথায় যাচ্ছেন, তার আমি কি জানি?

গিরীশ। ও-হো! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—দেশের বাড়ীতে।

সিন্ধেশ্বরী। তা ত যাচ্ছেন। কিন্তু তুমি তোমার ভবিষ্যতটা ভেবে দেখেছ কি?

গিরীশ। বর্তমান নিয়ে এখন এত ব্যস্ত! যে' ভবিষ্যৎ ভাববার সময় নেই।

সিন্ধেশ্বরী। তা বুঝেছি, নইলে আমার পোড়াকপাল এমন করে পুড়বে কেন?

গিরীশ। বলি তেত্রিশ বছর ঘর করে আজ এটা হঠাৎ আবিষ্কার করলে না কি?

সিন্ধেশ্বরী। নয়ত কি! আজ যদি তুমি চম্ চম্ বোঁজ, আমি না হয় কারুর বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে থাক। আর সে আমাকে কৰ্ত্তেই হবে, সে আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার মণি হরি যে কোথায় দাঁড়াবে তার—

গিরীশ। হরে! হরে কোথায় গেলিরে?

সিন্ধেশ্বরী। হরিকে আবার শুধু শুধু ডাকছ কেন?

গিরীশ। শুধু শুধু ডাকছি! এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

সিদ্ধেশ্বরী। কি ব্যবস্থা করবে তুমি?

গিরীশ। যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়।

ইতিমধ্যে হরিচরণ প্রবেশ করিল

হরিচরণ। আমায় ডাকছিলেন বাবা?

গিরীশ। হ্যাঁ, ডাকছিলুম। হারামজাদা, পাজী, ফের যদি তুই ঝগড়া করবি—ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙবে। লেখাপড়ার সঙ্গে সযত্ন নেই, কেবল দিনরাত খেলা—খেলা—খেলা—আর ঝগড়া—ঝগড়া—ঝগড়া? মনি কই?

হরিচরণ। (সভয়ে) জানি না।

গিরীশ। জানিস্ না? মনে করেছিন্ তোদের বজ্জাতি আমি টের পাই নে? আমার সব দিকে নজর আছে তা জানিস্? কে তোদের পড়ায় ডাক তাকে—

হরিচরণ। আমাদের খার্ড মাষ্টার ধীরেন বাবু ত সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ। সকালে কেন? রাত্রে পড়ায় না কেন, তুমি? আমি চাইনে এমন মাষ্টার। যা মন দিয়ে পড়'গে যা—হারামজাদা বজ্জাত!

হরিচরণ কান্দ কান্দ হইয়া চলিয়া গেল—গিরীশ সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলেন।

দেখ্ ছ আজকালকার মাষ্টারগুলোর স্বভাব! কেবল টাকা নেবে—আর ফাঁকি দেবে। ভাল ক'রে পড়াবে না। শুদ্ধ ফাঁকি দেবার মতলব। রমেশকে বলে দিও—কালই যেন, ও মাষ্টারকে জবাব দিয়ে, পরাগ মাষ্টারকে রেখে দেয়। মনে করেছে আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে?

দিক্বেখরী। ধূলো আর দেবে কি? ধূলোয় ত তোমার ছ'টা চক্ষু বুঁজে আছে।

এহান

সপ্তম দৃষ্ট

গিরীশের বাটার অন্তরমহল

শৈলজার ঘরের সামনে বার, বিহানা ও সাংসারিক অজ্ঞাত জিনিসপত্র এবং একটি হারিকেন পড়িয়া আছে। শৈলজা একখানি চণ্ডা লাল পাড় সাড়ি ও গায়ে তুহপত্বক জামা পরিয়া, কানাই ও পটলকে সেইরূপ করসা জামা স্কাপড় পরাইয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন—নীলা সজলনেত্রে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। রমেশ গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল, হরলাল তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিবার জন্ত গিয়াছে। নীলা আবারের হয়ে শৈলজাকে বলিল।

নীলা। আমিও তোমার সঙ্গে যাব ছোট খুড়িমা?

শৈল। আজ আর আমার সঙ্গে যায় না মা, এর পরে বেও—

নীলা। না। আমি আজই যাবো? তাহলে তুমি কানাই আর পটলকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

শৈল। ওরা কী আমায় ছেড়ে থাকতে পারে?

নীলা। না, পারে না বৈ কি! সেবার তুমি যখন তোমার মাসীমার বাড়ী পটলডালার গেলে; কানাই, পটল তো তখন মার কাছেই ছিল।

কানাই। সেই ভালো মা, মিসি তোমার সঙ্গে থাক—আমি বয়ং থাকি।

শৈল। তা হয় না কানাই। তোমাকে পটলকে সঙ্গে না নিয়ে, আমি যাবো না। তোমরা আজকাল বড্ড ছটু হয়েছো।

কানাই। কিছু হুঁটুমী করবো না মা। তুমি বরং এসে বড়মাকে জিজ্ঞেস করো—।

নীলা। সেই ভালো! কানাই থাক—আমি যাই। তুমি চলে যেওনা ছোট খুড়িমা, আমি চট করে জামা কাপড়টা বদলে একুনি আসছি।

নীলার দ্রুত প্রস্থান

কানাই। তাহলে আমি থাকি মা

শৈল। না, তোমাকে থাকতে হবে না। দিদির শরীর খারাপ তুমি তাঁকে বড্ড জ্বালাতন কর, তোমাকে আমি কিছুতেই রেখে যাব না। চল, দিদিকে প্রণাম করে আসি।

শৈলজা কানাই ও পটলকে লইয়া দু একপদ অগ্রসর হইতেই—

হরলাল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শৈল। গাড়ী এসেছে হরলাল ?

হর। হ্যা ছোট মা—! ছোটবাবু গাড়ীও নিয়ে এসেছেন, বাইরে অপেক্ষা করছেন।

শৈল। তুমি ততক্ষণ মোটঘাটগুলো গাড়ীতে তুলে দাও। আর ছোট বাবুকে বলো, দিদিকে এসে প্রণাম করে যেতে।

হর। আচ্ছা মা।

শৈলজা কানাই ও পটলকে লইয়া প্রস্থান করিল।

হরলাল নোট লইয়া বাহির হইতে বাইবে এমন সময়

সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিদ্ধে। ছোট বৌ কি সত্যিই চলে যাচ্ছে হরলাল ?

হর। হ্যা মা, ছোটবাবু গাড়ীও ডেকে এনেছেন।

সিদ্ধে। আচ্ছা, তুইই বল হরলাল, কী এমন অজ্ঞার কথাটা আমি বলে-

ছিলাম, মেজবো, না হয় অবুঝ, কিন্তু তুই তো অবুঝ নোস্। তোকে ত আমি এতটুকু এনে মাহুস করেছি। তোরা উপর বিশ্বাস করে আমি যে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়েছি, সে কেন? তোরা উপর জোর আছে বলেই না?

হর। সে তো ঠিক কথা।

সিন্ধে। কিন্তু তুই সেই কথাটাকে ধরে বসে থাকলি! আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলি না? যাক্, আমি কিছু বলতে চাই না, ধর্ম আছেন, ভগবান আছেন, তিনি এর বিচার করবেন।

হর। ছোট বাবুকে তাই তো বলছিলাম বড়মা! যে সংসারে থাকতে গেলে, এ রকম তো হয়েই থাকে। তা আমার কথা তো আর শুনলেন না।

সিন্ধে। তুই বুঝমান, তোকে আর কি বলব বাবা, সঙ্গে যখন যাচ্ছিন্, দেখি—ওদের বাতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট না হয়।

হর। সে আর বলতে! দেখবার জন্মেই তো যাচ্ছি বড় মা।

সিন্ধে। পটলাটা সন্ধ্যাবেলা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে; তুলে না খাওয়ালে—খাওয়াই হয় না। আবার কানাইটা আধ-পেটা খেয়ে উঠে পড়ে!

হর। ওর জন্ত তুমি কিছু ভেবনা বড় মা, আমি সব দেখবো। যাই—গাড়ী এসে গিয়েছে—মোটঘাটগুলো তুলে দিই গে—

সিন্ধে। ছোটবো বুঝি ছেলে ছোটোকে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে?

হর। না, তিনি তো আপনাকে পেয়ারা করতে এই দিকেই গেলেন—

হরলাল মোট তুলিবার উত্তোগ করিল। সিন্ধেবরী বলিলেন।

সিন্ধে। আর পেয়ারা কাক নেই। সকলের বড় হয়ে, আজ আমি সকলের ছোট হয়ে আছি।

হরলাল ইতিমধ্যে মোট লইয়া চলিয়া গেল। অপর দিক হইতে গটল ও কানাইকে

লইয়া শৈলজা প্রবেশ করিল। গলায় আঁচল দিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিল। ইহার মাঝে রমেশও আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ প্রণাম করিল। শৈলজা কানাই ও পটলকে বলিলেন।

শৈল। বড় মাকে প্রণাম করো—

সিন্ধে। ওদের প্রণামের অপেক্ষা আমি করবো না! ওদের ওপর আমার যে আশীর্বাদ আছে—তা চিরদিন থাকবে। (কাঁদিয়া) ওরা বড় হোক—মাহুঘ হোক—স্থখী হোক, কিন্তু এইটাই কি উচিত হলো ছোটবো? মার কাছ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া? আমি কিছু বলতে চাই না, যিনি দিনরাত করছেন, তিনি এর বিচার করবেন।

কানাই পটলকে লইয়া রমেশ ও শৈলজা প্রস্থান করিল।

সিদ্ধেশ্বরী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সিন্ধে। কী এমন আমি বলেছিলুম, যার জন্তে এমনি করে চলে যেতে হবে? বড় হলে আমি না হয় পায়েই ধরিনি, ঘাট মানিনি, তাই বলে, ভুল যা করেছি—তা কি আমি স্বীকার করিনি, আমাকে না হয় “বল্লৈই হতো, দিদি এটা তোমার অজ্ঞায় হয়েছে। আমি মেনে নিতুম। তাই বলে, ওই মা-মরা দু’মাসের ছেলেটাকে, যাকে আমি বুকের কাছে রেখে দেড় বছরের করেছিলুম—তাকে এমনি করে নিয়ে যাওয়া? তখন তুই ছিলি কোথায়? আমিই তো তাকে মাহুঘ করেছিলুম।

ইতিমধ্যে নয়নতারা প্রবেশ করিয়াও সমস্ত ব্যাপারটি দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিল।

অপর দিক দিয়া নীলা ভাল জামাকাপড় পরিয়া সালিয়া-গুলিয়া
ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল।

নীলা। ছোট খুড়িমা কোথায় গেলেন মা ?

সিন্ধেরী কাঁদিয়া কহিলেন।

সিন্ধে। তারা চলে গেছে !

নীলা। (কাঁদিয়া) এঁ্যা ! ছোট খুড়িমা চলে গেলেন—পটল, কানাই ?

সিন্ধে। (নীলাকে বুকের কাছে টানিয়া) তারা সবাই চলে গেল মা !

সবাই চলে গেল !

নীলা। আমি যে ছোট খুড়িমার সঙ্গে যাবো বলে ছুটে এলাম মা !

সিন্ধে। (কাঁদিয়া) সে পাষাণী ! তাই নিয়েও গেল না ! থেকেও

গেল না !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিন্ধেখরীর শয়ন কক্ষ ।

তখন রাত্রি ১১টা-১২টা । সিন্ধেখরী শয্যার উপর বালিশে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন । তাঁহাকে আজ অধিকতর ক্লান্ত, চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে । খাটের অদূরে একটি ইকি-চেয়ারে বসিয়া গিরীশ মনোযোগ সহকারে ব্রীক্ পাঠ করিতেছিলেন । পার্শ্বে একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল ।

সিন্ধে । কানাই-এর শোওয়া খারাপ, তাকে নিয়ে ওরা মেঝেয় শোয়
কি খাটে শোয় কে জানে ? খাটে শোয়ালে, নিশ্চয়ই একদিন পড়ে
গিয়ে হাত পাঁ ভাঙ্বে !

গিরীশ । (সহসা চম্কাইয়া) এঁা ! কার পা ভাঙ্বে ?

সিন্ধে । ভাঙেনি ; কিন্তু খাট থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙ্বে কতক্ষণ ?

গিরীশ । সরে বস ।

সিন্ধে । আমি সরে বসতে গেলাম কেন ? কানাই-এর শোওয়া খারাপ
তাই বলছি !

গিরীশ । ও !

সিন্ধে । পটুলাটার রাত্রি বেলায় কিদে পায়, ঘুম থেকে উঠে দুটো বসন্তুতি
না খেলে তার ঘুম হয় না । মা-র যা হ'স, তাকে উঠে খাওয়াবে
কিনা কে জানে ? ছেলেটা হয় ত কিদেয় এতক্ষণ ছটফট্ করছে—
বল, ঠিক বলেছি কিনা ?

গিরীশ। (অশ্রুমনস্ক হইয়া) তা হতে পারে।

সিন্ধে। হতে পারে নয়, এ হয়ে বসে আছে—আমি দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

গিরীশ। তা হবে।

সিন্ধেশ্বরী। কিন্তু ওদের ভরসায়, এইভাবে কি ছেলে দু'টোকে ওখানে ফেলে রাখা উচিত ?

গিরীশ। কখনো নয়।

সিন্ধেশ্বরী। (অভিমানে) নয় ত মান্‌লুম। কিন্তু তার ব্যবস্থা কী করছ ?

গিরীশ। যা হোক একটা কিছু কর্তে হবে।

সিন্ধেশ্বরী। কিন্তু সে কবে ?—আচ্ছা পটলকে শৈল না হয় নিয়ে গেল, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়—সতীন পো! তার ওপর শৈলর জোর কী ?

গিরীশ। কিছু না।

সিন্ধেশ্বরী। তা'হলে আমরা ত তার নামে নালিশ করতে পারি।

গিরীশ। পারি বৈ কি !

সিন্ধেশ্বরী। নালিশ করলে নিশ্চয়ই তার সাজা হবে ?

গিরীশ। ভঁ ! হবে !

সিন্ধে। আচ্ছা সে যেন হলো, কিন্তু পটল ওর পেটের ছেলে হলে কী হয় ? আমিই তো তাকে মানুষ করেছি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, যে সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাছাড়া আমার কথা ভেবে ভেবে তার শক্ত অস্থির হতে পারে। তা'হলে হাকিম কী রায় দেবে না—যে সে তার জ্যেষ্ঠাইমার কাছে থাকুক।

সিন্ধেশ্বরী গিরীশের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাজা না পাওয়ার বিরক্তভাবে কহিলেন।

কী বলছি শুনতে পাচ্ছ ? না. না ?

গিরীশ। হ্যাঁ!

সিন্ধে। বলছি হাকিম কী বায় দেবে না?

গিরীশ। নিশ্চয়ই না।

সিন্ধে। কেন নয়? মা বলেই যে সে ছেলেকে মেরে ফেলবে, এমন তো কোন লুকুম নেই—মেজ্জঠাকুরপোকে দিয়ে কাল যদি উকিলের চিঠি দেই—কী হয় তা হলে?

গিরীশ। খুব ভাল হয়, কিন্তু কথায় কথায় যে অনেক রাত হয়ে গেল! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। আমি বরং কাগজপত্রগুলো নিয়ে ওঘরে পড়ি গে যাই।

সিন্ধেশ্বরী শয়ন করিতে করিতে বলিলেন।

সিন্ধে। কাল যদি আমি মেজ্জঠাকুরপোকে দিয়ে উকিলের চিঠি না দেওয়াই—তবে আমার নাম সিন্ধেশ্বরীই নয়।

গিরীশ। এখন সিদ্ধিনাতা গণেশ তোমার চোখে ঘুম দিলেই বাচি।

গিরীশ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দরজার কাছে হুইচ্টি অফ্ কারয়া দ্বিগ্না ঘর ছইতে বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরে বীরে মঞ্চটা আলোকিত হইল। দেখা গেল—সকাল হইয়াছে। সিন্ধেশ্বরী ব্রাস্ত ও চিন্তিত মনে একাকী পাটের ওপর বসিয়া আছেন। হরিশ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল।

হরিশ। কী ব্যাপার বৌঠান? সকালবেলাতেই তলব?

সিন্ধে। একটা জরুরী বিষয়ে পরামর্শের জন্তে—। বদ, মেজ্জঠাকুরপো।

হরিশ একটা চেয়ারে বসিল।

সিন্ধে। দেখ, দেবী করলে চলবে না। এক্ষুণি ছোট্টঠাকুরপোদের নামে একটা উকিলের চিঠি লিখে দরওয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আর

চিঠির মধ্যে বেশ কড়া করে জানিয়ে দাও যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর জবাব না পেলে নালিশ করবো।

হরিশ। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো বোঠান? কি কি জিনিস নিয়ে সরে পড়লো? গয়নাগাটি কিছু নিয়ে পালায় নি তো?

সিন্ধে। না।

হরিশ। নগদ টাকা?

সিন্ধে। তাও না।

হরিশ। বাসনকোসন? দাবীটা একটু বেশী হবে দেওয়া চাই—
বুঝলে না?

সিন্ধে। তা দাবীটা একটু বেশী ঠাকুরপো, তবে ওসব কিছু নয়। আমি কানাই আর পট্টলাকে ওদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কেন না, কানাই ছোটবোয়ের পেটের ছেলে নয়। আর পট্টলাকে মানুষ করেছি আমি। কাজেই আমার অমতে ছোটবো তাদের নিয়ে যেতে পারে না, এই আমার দাবী—এই আমার নালিশ।

হরিশ। তুমি কেপেছ বোঠান? আমি বলি বা আর কিছু, আরে তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তা তুমি করবে কী?

সিন্ধে। তা তোমার দাদা যে বললেন—নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে?

হরিশ। দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে ভামাসা করছেন—

সিন্ধে। এতটা ব্যয়স হলো ভামাসা কাকে বলে বুঝি না ঠাকুরপো! তোমার মনোগত ইচ্ছা নয় যে, ছেলে দুটোকে আমার কাছে আনি—তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ। তুমি ভুল বুঝছ বোঠান, এই নিয়ে নালিশ চলে না।

সিন্ধে । বেশ, তুমি না পার, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেন উকিলের কাছ থেকে লিখিয়ে আনছি ।

হরিশ । কোন উকিলই এই ব্যাপার নিয়ে চিঠি দেবে না বৌঠান । তবে তাকে যদি জব্দ করতে চাও—তাহলে অন্ত কোন দাবী দাওয়া উত্থাপন করে বা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে তাকে জব্দ করা যেতে পারে । আর আমাদের উচিতও এখন তাই করা ।

সিন্ধে । তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো ! আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখন আমি মিথ্যে দাবী-দাওয়া উত্থাপন করতে পারবো না ।—

হরিশ । তবে আমি আর কী করব ?

হরিশ প্রস্থান করিল । সিন্ধেশ্বরী সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন ।

অপর দিক হইতে সরকার গণেশ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন ।

গণেশ । মা !

সিন্ধে । কে ? ও-গণেশ !

গণেশ । হ্যাঁ মা, এই হিসেবটা—

সিন্ধে । দেখ গণেশ, তোমার কী হিসেব দেবার একটা সময় অসময় নেই ?—

গণেশ । কী করি মা ! আপনাদের টাকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করি ; গরীব মানুষ, পাছে টাকা পয়সার গুণগোল হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে খালাস হতে চাই—

সিন্ধে । কিন্তু আমারও ত একটা সময়-অসময় আছে গণেশ । দাও কী হিসেব দেবে, দাও—

গণেশ । আপনি আমার খরচের জন্তে যা দিয়েছিলেন—তার মধ্যে মণিহারী দোকানে বাকী ছিল বায়ো টাকা, মেজমার ছেলেমেয়েদের

কুলের মাইনে বাবদ দিয়েছি তিরিশ টাকা, আর খুচরা খরচ হয়েছে আট টাকা। বাজারে দেনা আছে দু'টাকা।

সিন্ধে। বারো গুণা টাকা আমি তোমায় দিলাম, তাতেও আবার দেনা রেখে এলে গণেশ ?

গণেশ। আজ্ঞে মেজমার ক'টা খুচরো জিনিষ কিন্তে দু'টাকা দেনা-হয়ে গেল !

সিন্ধে। তাহলে মোট খরচ হলো কত তাই শুনি—

গণেশ। আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা।

সিন্ধে। দেখ গণেশ, আমি লেখা-পড়া জানিনে বলেই যে তুমি আমাকে বোকা বুঝিয়ে যাবে—তা মনে করো না। বারো গুণার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচা হয়েছে বলে পঞ্চাশটা টাকা সবই খরচ হয়ে গেছে ! আর কিছু নেই !

গণেশ। সত্যি আর কিছু নেই—বরং দু'টাকা ধার হয়েছে।

সিন্ধে। তা হলে তুমি বলতে চাও—এই বারো গুণা-টাকার উপর আরো দু'টাকা ধার হয়েছে।

গণেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয় দিদিমণিকে ডেকে হিসেবটা—

সিন্ধে। নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে ? সে কি আমার চেয়ে বেশী বুঝবে ? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করে হিসেব দেবে, তা হবে না। সে যদি আজ থাকতো—তাহলে, কি আজ আমাকে এত ঝগড়াট পোয়াতে হতো—পোড়ারমুখীকে দশ বছরের বৌ করে ঘরে আনলুম, বুক করে মালুম করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ীর দু'দুটো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল ! তা থাক, আমিও খবর রাখছি ; কানাই পটলের যদি কোনদিন এতটুকু অসুখ হয়েছে শুনতে পাই—তাহলে দেখব

সেদিন, কেমন করে সে ছেলে ছুটোকে আটকে রাখে ? তা দাঁড়িয়ে
রইলে কেন গণেশ ? এখন যাও । ছপুর্ বেলা মনে করে বলে যেও—
এত গুলোটাকা কি করলে ।

গণেশ । আচ্ছা মা ।

গণেশের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া নয়নগারার প্রবেশ

নয়ন । গণেশকে কী বলছিলে দিদি ?

সিন্ধে । এই হিসেব-পত্তর ; যে ঝগ্গাট আমি মোটেই সহ্য করতে
পারি না ।

নয়ন । তা বেশ তো, তুমিই বা এত ঝগ্গাট সহ্য করবে কেন ? ছোটবো
না হয় নেই কিন্তু আমি তো রয়েছি । তুমি যদি বলো তাহলে
আমিই না হয় কাল থেকে হিসেব পত্তর দেখবো । আমার কাছে
কারুর চালাকী করে ভুল হিসাব দেবার উপায় নেই ।—

সিন্ধে । তা বেশ তো, কাল থেকে তুমিই হিসেব রেখো মেজবো ! আমার
এই অস্থখ শরীরে এত হাঙ্গামা ভাল লাগে না । শৈল ছিল, যেখান-
কার যত টাকা—তার হিসেব রাখা, খরচ করা, এ সমস্ত সেই করত ।
এ সমস্ত কী আমার দ্বারা হয় ? বেশ তো এখন থেকে না হয়—
তুমিই এ সব করো মেজবো ।

সিন্ধেবরীর আঁচলের চাবিটা হাতে ছিল, নয়নতারার হাত বাড়াইলেন, ভাবিলেন, তিনি
বোধহয় চাবিটা তাহাকে দিবেন কিন্তু সিন্ধেবরী চাবিটা তো তাহাকে দিলেনই না
উপরত চাবিটা আঁচলে আরো শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কাঁধের উপর কেলিলেন ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোট বিষ্ণুপুর গ্রাম। রমেশদের পৈতৃক বাড়ী

অন্ধরমহল, উঠানের মাঝখানে পাথরুয়া, দুই দিকে ঘরের সংলগ্ন খোলা দালান।
বাড়ীটির চারিদিকে পাটল দিয়ে ঘেরা। তখন অপরাহ্ন। উঠানের মাঝে একটা শ্রোতৃ
লোক প্রবেশ করিল—তাহার নাম বেহারী। তাহার সাজসজ্জা অদ্ভুত রকমের, গায়ে
বহুবিধ রঙের একটা বেনিটান, পরণে গৈরিকবাস, হাতে ও গলায় কড়ির মালা,
গলায় ছোট্ট একটা চামর ঝুলিতেছে, পায়ে ঝাঁকর, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা—তাঁহাতে
ময়ূরপুচ্ছ পোঁজা, সহসা নৃত্যের ভঙ্গিতে উঠানের মাঝে প্রবেশ করিয়া আপন মনেই বলিল।

বেহারী : রোগ বালাই দূরে থাক্ ।
 কৰ্ত্তা গিন্নী স্নেহে থাক্ ॥
 সংসারের হোক বার-বাড়ন্ত ।
 আমি যেন হই পয়মন্ত ॥

এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে হরলাল প্রবেশ করিয়া বলিল।

হর। ওহে পয়মন্ত ! আন্তে আন্তে সরে পড় দেখি—

বেহারী। আমি এলে তুমি ওরকম কর কেন বল দেখি ?

হর। সময় নেই, অসময় নেই, তুমিই বা ওরকম শ্রমুর বাজিয়ে আস কেন
বল দেখি ?

বেহারী। বেশ করি আসি। মাঠাকরুণ দাদাবাবুরা ভালবাসেন তাই
আসি।

হর। তা অল্প দিন এসো, আজ এখন যাও। ছেলে দুটো জরে কোঁ
কোঁ করছে, মা তাদের কাছে বসে আছেন, আজ আর দেখা
হবে না।

বেহারী। তোমার কথায় দেখা হবে না? বলি, তুমি কি বাড়ীর কর্তা নাকি?

হর। আঃ মর! আবার চোপা করে? বেরো বোরো—বল্ছি।

বেহারী। খবরদার! অমন কথা বলবে না বলে দিচ্ছি, পাঁচখানা গাঁয়ের

লোক আমাকে বলে পয়মস্ত, আমার কল্যাণে হয় লোকের বাড়-

বাড়ন্ত! আর আমাকে বলে কিনা বোরো—

হর। বেশ করি বলি—কেন তুই সময় নেই অসময় নেই আসিস্?

বেহারী। বেশ করবো—আসবো।

ঝগড়া শুনিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া শৈলজা কহিলেন।

শৈল। কার সঙ্গে ঝগড়া করুছ হরলাল?

বেহারী পায়ের ওপর পা দিয়া কুকের অনুরূপ ভঙ্গিতে ঝাড়াইয়া কহিল।

বেহারী। মা গো! তোমার এই পয়মস্ত ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করছে মা!

হর। পয়মস্ত তো কতো! ছেলে দুটো রোগে ভুগছে, ভিটে-মাটি নিয়ে

মামুলা চলছে, বাবুর আমার শরীরের দিকে চাওয়া যায় না—

শৈল। আঃ! হরলাল! তার জন্ত ও কি করবে? অদৃষ্ট ছাড়া কি

মানুষের পথ আছে?

বেহারী। তবেই বলনা মা!

শৈল। তুমি কাল এসো বেহারী। ছেলে দুটোর আজ আবার খুব

জ্বর এসেছে। কাল বয়ং তোমার ঘোড়া নিয়ে এসো—ওরা

গান শুনবে।

বেহারী। সেই ভালো। ঘোড়া আমি বাইরে বেঁধে রেখে দাদাবাবু-

দের খবরটা নিতে এলাম। দাদাবাবুরা আমার গান শুনতে বড়-

ভালবাসে কিনা ? আচ্ছা, তাহলে আজ আমি আসি মা । কাল
আবার আসবো ।

বেহারী সূত্যের ভঙ্গিমায় চলিয়া যাইতেছিল, তার ঘুরুরেয় আঙুরাজে কানাই ও
পটল মুড়িমুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

তাহাদের দেখিয়া বেহারী সানন্দে কিরিয়া কহিল ।

বেহারী । এসো এসো, দাদাবাবুরা এসো । বড় জর হয়েছে শুনছি ?
এসো—তোমাদের মাথায় ঠাকুরের চামর বুলিয়ে দিই—সব রোগ
বালাই ভাল হয়ে যাবে ।

গলায় বাধা চামরটি কানাই ও পটলের মাথায় বুলাইয়া দিয়া
আগেকারের ছড়াটি পুনরায় আবৃত্তি করিল ।

রোগ বালাই দূরে থাক্ ।

কর্তা গিন্নী স্তখে থাক্ ॥

সংসারের হোক বার-বাড়ন্ত ।

আমি যেন হই পয়মন্ত ॥

পটল । আজ তোমার ঘোড়া আননি বেহারী ?

বেহারী । ই্যা এনেছি বৈ কি ! বাইরে বেঁধে রেখেছি—ঘাস খাচ্ছে ।

কানাই । তা তোমার ঘোড়াটাকে আনো না ? একটু গান শুনি ।

বেহারী । (সানন্দে) শুনবে ? তা আনি ।

বেহারী সূত্যের ভঙ্গিমায় চলিয়া গেল ।

হরলাল সঙ্কোচে কহিল ।

হর । ঐ জন্তাই ত ওটাকে তাড়াতে চাইছিলাম । ওকে দেখলে
দাদাবাবুরা ছাড়তে চায় না । একে সব জরে কাঁপছে ! তার ওপক
বসে বসে গান শুনলে—জ্বর আরো বেড়ে যাবে না ?

শৈল। গান শুনে কি আর এমন হবে হরলাল ? ওতে তবু ওদের মনটা ভুলে থাকবে। সেখানে একবাড়ী ছেলেমেয়ের মধ্যে ওরা থাকতো, আর এখানে এসে সঙ্গী না পেয়ে, মনমরা হয়ে থেকেই আরও ওদের রোগ সারছে না।

হর। সবই বুঝি মা ! কিন্তু সংসারের অবস্থা দেখে, ভয় হয় ! একে মেজবাবু মামলা মোকদ্দমা করলো ; তাই নিয়ে ছোটবাবুকে কোর্ট ঘর করতে হচ্ছে। তার ওপর আবার এই ছেলেদের অসুখ, রোগের ওষুধপত্রি, মামলার খরচ, কোথা থেকে যে কি হবে আমি শুধু তাই ভাবছি।

শৈল। ভেবে লাভ নেই হরলাল !

ইতিমধ্যে বেহারী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিল। ঘোড়া অর্থাৎ ঘোড়ার অনুরূপ বৃহৎ পুতুল কোমরের সঙ্গে বাধিয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল।

বেহারীর গান

হেঁতা যুগে যজ্ঞ-ঘোড়া ধরেছিল লব
(ওগো) রামচন্দ্রের কারিকুরি ধরেছিল সব ॥
সে ঘোড়া ধরা দিয়ে, ধরে আনে—
বাগের বেটাকে।—
বলো না, সেই পশুটা আসল কিনা
মিলন ঘটতে।
এ ঘোড়া খায়না কো ঘাস—
বয় বারো ঘাস,
লোকের বাড়ী বাড়ী—
(আর) দুঃখ নিয়ে ছুটে পালায়—
আনে পরের কাড়ি।

বেহারী ঘোড়া লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিল। তাহার গান শুনিয়া
কানাই ও পটলের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। জেলেদের মুখে হাসি
দেখিয়া শৈলজা ও হরলালের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল।
গীতান্ত্রে বেহারী উচ্চৈশ্বরে কহিল।

বেহারী।

চল ঘোড়া—ছুটে চল
রোগ বালাই নিয়ে চল,
আবার আসবি যবে—
পয় আনবি তবে ॥
হ্যাট্-হ্যাট্-হ্যাট্-হ্যাট্—

ঘোড়া হাঁকাইবার মত করিয়া বেহারী মূর্ছার মধ্যে দৃশ্য হইতে অন্তর্হিত হইল।
কানাই ও পটল সমুদরে কহিল।

কানাই ও পটল। আবার এসো বেহারী। আবার এসো—

তৃতীয় দৃশ্য

গিরীশের ডুইং রুম

তখন বৈকাল। হরিশ সবোমাত্র কোট হইতে ফিরিয়া নয়নতারা
সহিত কথা কহিতেছেন।

হরিশ। এত ত কর্লে, কিন্তু বোঠানের কাছ থেকে চাবিটি ত আজও
আদায় করিতে পারলে না।

নয়ন। দেখ না পারি কিনা? সংসারের হিসেব হাতে নিয়েছি। চাবি
হাতে আস্তে আর কৃতকণ?

হরিশ। দেখো, 'সব তোমার আর চাবিকাঠিটি আমার', এই প্রবাদ-
বাক্যটি বোঁঠান না তোমার ওপর দিয়ে চালান।

নয়ন। হঁ! চালালেই হোল! মনে রেখো—আমি উকিলের বউ।

হরিশ। তুমিও মনে রেখো—বোঁঠানও উকিলের বউ।

নয়ন। সে কথা মানি। কিন্তু দিদির মত আমি একেবারে নীয়েটু নই।
পেটে আমার একটু বিত্তে আছে। ছোট বোঁ ঐ বিত্তেটুকুর
জ্বারেই দিদিকে ঠকিয়ে বেশ কিছু গুছিয়ে নিম্নে সরে পড়েছে—

হরিশ। দেখ, তুমি যদি কিছু গোছাতে পার।

নয়ন। আমি ঠিক আছি। এখন তুমি মামলায় জিতলে তবেই
বুঝব।

হরিশ। মামলায় জিত্তো হ'বেই—

নয়ন। ছোটঠাকুরপো ভাগ বসাতে পারবে না?

হরিশ। এক কাণা কড়িও না। তবে হ্যাঁ, বিদেশ থেকে সময় মত
সংসারে এসে না ঢুকলে—রমেশ আমাদের একই পরিবারের লোক
হিসেবে একটা ভাগ আদায় করত—সে বিষয় সন্দেহ নেই।

নয়ন। তাই বুঝি চুঁচড়ার জাল গুটিয়ে তড়াঁতাড়ি চলে এলে?

হরিশ। এটা আর বুঝতে পারলে না? নইলে অতোদিনের প্র্যাক্টিস্টা
ছেড়ে, তাড়াতাড়ি কি আর কলকাতায় চলে আসি? আর দিনকতক
পরে এলে, দাদা নিজেই হয়ত তাকে একটা ভাগ লিখে দিতেন।
বিষয়সম্পত্তি যা করেছেন সে তো দাদা নিজে রোজগার করে; তাঁর
বিষয় তিনি যাকে খুসী তাকে দিয়ে যেতে পারেন। দেখলাম,
রমেশকে তিনি যে রকম ভালবাসেন, তাতে এখানে এসে মাথা না-
গলালে আর উপায় ছিল না।

নয়ন। সত্যি, তোমার কি মাথা! এমন না হলে উকীল!

হরিণ। তাই পয়লা নম্বর তাঁকে এখন থেকে তাড়ালাম, দোসরা নম্বর দেশের বাড়ী থেকে তাড়ানোরও চেষ্টা চলছে—নইলে সেখানে থাকলেও একই পরিবারভুক্ত প্রমাণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'বে না। খুড়তুতো ভাই, সে যে মুফাৎসে দাদার বিষয়ে ভাগ বসাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না—

অদূরে সিঙ্কেবরীকে আসিতে দেখিলা

নয়ন। চুপ্‌দিদি আসছেন (ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) দিদির বা শরীর হয়েছে কতদিনে যে সেরে উঠবেন তা জানি না। ডাক্তারি ত অনেকদিন হ'লো এবার একজন ভাল কবিরাজকে দেখালে হয় না ?

নয়নতারার কথার মাথের সিঙ্কেবরীর প্রবেশ

সিঙ্কে। ডাক্তার বন্ধি দেখিয়ে আর কী হবে মেজবৌ ? জর জালা ত এখন ভাল হয়ে গিয়েছে।

নয়ন। জরটাই না হয় ছেড়েছে, কিন্তু অল্প উপসর্গ ত লেগেই রয়েছে।
হরিণ। সে উপসর্গ ত আর একদিনেই যাবার নয় মেজবৌ ! ভুলতে কিছুদিন সময় লাগ'বে ত !

সিঙ্কে। ঠিক বলেছ—মেজ ঠাকুরপো ! এ আমার মনের উপসর্গ ! কিছুতেই ওদের ভুলতে পারছি না। যে আঘাত ওরা আমাকে দিয়ে গেছে, যিনি মাথার ওপর দিনরাত্রি করছেন তিনিই তার বিচার করবেন।

হরিণ। তোমার মনে ওরা যে কষ্ট দিয়েছে বোঠানু, আমি যদি তার শোধ তুলতে না পারি, ত আমার নামই নয়। রমেশ এতবড় নেমক-হারাম যে আমাদের খেয়েপরে মাছ হ'য়ে, শেষে কিনা আমাদেরই নামে মাছলা কর্লে !

সিন্ধে। বল কি মেজ ঠাকুরপো! ছোট ঠাকুরপো তোমাদের নামে মামলা করেছে?

হরিণ। ই্যা। দেওয়ানী ত আছেই—উপরন্ত গোটা দুই ফোজদারীও চলেছে।

সিন্ধে। (সবিস্ময়ে) বল কি!

হরিণ। ই্যা। দাদাকে ভালমানুষ পেয়ে, ও বা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করেছে।

তাই মামলা মোকদ্দমা চালানোর ভার আমি নিজের হাতে নিয়েছি।

সিন্ধে। কিন্তু আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না মেজ ঠাকুরপো!

সে এত বেইমানী করতে সাহস করলে কী করে? এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উঠছে—

নয়ন। সে ত উঠছেই, আর ছোট দেওয়ার তোমরা কী না করছ?

পাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছ, হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিয়েছ। ব্যবসা করার নাম করে তখন ত আর ব্যবসা করেনি—টাকাগুলো জমিয়ে রেখেছিলো। এখন সেই টাকার জোরে মামলা লড়ছে—

সিন্ধে। তা মামলা কেন?

হরিণ। দেখলুম, দেশের বিষয়ই বিষয়। আমাদের অবর্ত্তমানে, আমাদের মণি হরি বিপিন এরা এককাঠা জায়গা-জমি ত পাবেই না, এমন কি দেশের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢুকতে পাবে না। দেশে বা কিছু আছে—সে সমস্ত সেই ত দখল করে আছে। খাজনাপত্র আদায় করছে, খাচ্ছে—দাচ্ছে একটা পয়সা দেবার নাম করে না। বিষয় যা কিছু সে ত দাদাই করেছেন অথচ সে আজ দাদার চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেয় না—এমনি নেমকহারাম। আমারও প্রতিজ্ঞা! ওকে আমি বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব।

সিদ্ধে । তা হ'লে ওরাই বা ছেলেপুলে নিয়ে যাবে কোথায় ?

হরিশ । সে খবরে ত আমাদের দরকার নেই বোঁঠান !

সিদ্ধে । তা তোমার দাদা কী বলেন ?

হরিশ । দাদা যদি তেমন হতেন, তা'হলে আর ভাবনা কী ছিলো বোঁঠান ! তাকে তখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেগিয়ে দিলাম, তাঁর টাকায়, তাঁর পেয়ে পরে মাগুম হয়ে আজ তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েছে, তখন তিনি মত দিলেন । ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেও জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টায় ছিল । অনেক কষ্টে সেটা আমায় ফাঁসাতে হয়েছে ।

নয়ন । আচ্ছা, ছোট ঠাকুরপো না হয় দোষী । কিন্তু আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবো—ছোটবো এতে মত দিলে কি করে ? আমরা আর সবাই না হয় ছুটু বজ্জাত হতে পারি কিন্তু—

নেপথ্যে গিরীশের গলা শোনা গেল—

গিরীশ । হরিশ, হরিশ—

গিরীশের গলা শুনিয়া নয়নতারা ঘোমটা দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ।

গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে খরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

গিরীশ । দেখ, হরিশ, কালকে আমাকে একবার দেশে যেতে হচ্ছে—

হরিশ । দেশে যাবেন ?

গিরীশ । হ্যাঁ, যেতেই হবে । বিনোদ ঠাকুরদা, বাববার করে বলে গেছেন ; হাজার হোক আমাদের জাতি কুটুম্ব—তাঁর মেয়ে নেই, জামাই নেই, ঐ একটি মাত্র ন্যাতনী, তাঁর বিয়ে, না গেলে বড় দুঃখ করবেন ।

হরিশ । কিন্তু জয়পুরের মক্কেলদের যে কাল আসবার কথা আছে দাদা—

গিরীশ। তা আসবে বলে আর কি করব ?

হরিশ। আপনার বোধ হয় মনে নেই দাদা, কাল তাদের মামলার দিন—

গিরীশ। তা আর কি করব ? তুমিই না হয় কোনরকমে চালিয়ে
নিও—

হরিশ। তা কি হয় ? তারা যে—

গিরীশ। অসম্ভব হবেন ? তা আমি একা মাতুষ ; সকলকে ত আর
সম্ভব করতে পারি না। উকীল হয়ে পধ্যস্তই ত মিছে কথা বলে
আসছি। আজ না হয় কথা দিয়ে, একটা কথাও রাখি।

সিন্ধে। ঠিকই ত ! কেবল কাজ—কাজ করে বেড়ালেই ত হবে না।
লোক-লৌকিকতা এগুলোও ত রাখতে হবে।

গিরীশ। ঠিক—ঠিক ; (সিন্ধেশ্বরীর নিকট আগাইয়া গিয়া) তা তুমি
আজ কেমন আছো ?

সিন্ধে। তবু ভাল—জিজ্ঞাসা করলে !

গিরীশ। বিলক্ষণ ! জিজ্ঞাসা করিনে ? এই ত পরশু দিন মণিকে
ডেকে বল্লুম—মণি তোঁর মাকে ঠিকমত ওষুধ-টোষুধ দিস্ ত ? তা
আজকালকার ছেলেগুলো হয়েছে এমনি যে বাপ মাকে পধ্যস্ত
মানে না !

সিন্ধে। দেখ, বুড়ো বয়সে মিথো কথাগুলো আর বলে না ! পনের দিন
হয়ে গেল—মণি তার পিসীর ওখানে এলাহাবাদে গেছে—আর
তুমি তাকে পরশু দিন জিজ্ঞাসা করলে কি করে শুনি ?—তা বাক,
কিন্তু ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গে যে মামলা হচ্ছে—কই, এ কথা ত
তুমি এতদিন আমায় বল নি ?

গিরীশ। আরে মামলা ত হবেই। সেটা একটা চোর—চোর !
একেবারে লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে। বিষয়-আশয় সব নষ্ট করে ফেলে !

সেটাকে দূর করে না দিলে আর ভদ্রস্থ নেই। সমস্ত ছারখার করে দিলে—

সিন্ধে। আচ্ছা তা খেন দিলে। কিন্তু মামলা মোকদ্দমা ত আর শুধু শুধু হয় না টাকা খরচ করা চাই ত! ছোট ঠাকুরপোঁটাকা পাচ্ছে কোথা থেকে?

হরিশ। কেন? মেজবৌ ত তোমায় একটু আগেই বললেন বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে যে হাজার চারেক টাকা নিয়েছিলো—সেটা ত তার হাতে আছে। তাছাড়া ছোট বোমার হাতেই, ত এতদিন সংসারের টাকাকড়ি সমস্তই ছিল; বুঝেই দেখ না—কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে।

গিরীশ উত্তেজিতভাবে বলিলেন।

গিরীশ। আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে! কিছু কী রেখে গেছে? সেটা একটা বেহেট লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে। কিছু দিন আগে কোটে এসে বলে, বাড়ী ঘরদোর সব মেরামত করতে হবে—শীচণ টাকা চাই।

হরিশ। বলেন কী? সাহস তো কম নয়!

গিরীশ। সাহস বলে সাহস! একেবারে লম্বা কর্দ, এখানটা সারাজে হবে, ওখানটা গাঁথতে হবে। এটা না বদলালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। আরে শুধু কী তাই? তার ওপর বলে কিনা, সংসারের অনটন, শীতের কাপড় চোপড় কিনতে হবে, আলু, ধান কিনে রাখতে হবে। এমনি হাজারও খরচ দেখিয়ে—

হরিশ। নিলঞ্জ—তারপরে?

গিরীশ। নিলঞ্জ, বলে নিলঞ্জ, লজ্জা সরম একেবারে নেই! কর্দটর্দ দেখিয়ে ঠিক আটশ টাকা নিয়ে তবে ছাড়লো—

হরিশ। নিয়ে গেল! আপনি তাকে আবার টাকা দিলেন?

গিরীশ। না দিয়ে আর উপায় কী ?

হরিশ। তাহলে আর মামলা মোকদ্দমা করে লাভ কী দাদা ?

গিরীশ। না না, কিছু লাভ নেই। নিজের সংসার যে চালিয়ে নেবে, হতভাগার সেটুকুও ক্ষমতা নেই—এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে।
 সুনলাম বৈঠকখানায় দিলি আদ্রা বসিয়ে দিন রাত তাস পাশা চলছে—আর খাচ্ছেন। বাস। মাতুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েছে তাই, নব্বলে না হরিশ, আমাদেরও হয়েছে তাই।

কথাগুলি বলিয়া গিরীশ হো হো করিয়া হাসিবা ডগিলেন।

হরিশ। (বিবক্ভাবে) আচ্ছা। আমি একাই দেখছি। গ্রহান

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) কাল যখন দেশেই বাচ্ছ, তখন ছেলে দুটোকে—

গিরীশ। আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন।

চতুর্থ দৃশ্য

রমেশদেব পৈতৃক বাড়ীর একটি ঘর।

ঘরটি সামান্য আসবাব পত্রের সাজানো। সহরের বাক যে শৈলজার রূপ আমর! দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শৈলজা এখন সম্পূর্ণ গ্রাম্য-বধূ। তাহার ঘরেও গ্রাম্যচাপ হুপরিফুট। একটা জলচৌকির ওপর গোপালের মূর্তি। তাহারই সম্মুখে বসিয়া শৈলজাকে ধানহু দেখা গেল। শৈলজা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটা তুলিল। দেখা গেল- তাহার দুচক্ষু দিবা অবিরত চল গড়াইতেছে। অঙ্গে তাহার কোন গহনা নাই। মাত্র এক ছোড়া বালা ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া আছে। শৈলজা ব্যাধিত চিন্তে কহিল।

শৈল। ঠাকুর আর আমায় কিচ্ছু নেই, শেষ সম্বল এই এক ছোড়া বালা। এই নিয়ে এবার যেমন করেই হোক আমার নিষ্কৃত দাও।

রমেশ মোকদ্দমার ~~কাজ~~ লইয়া গুরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈলজা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। যথারীতি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন।

আমার ছেলেবা রোগে ভুগছে, পয়সার অভাবে পত্তি পাচ্ছে না, চিকিৎসা হচ্ছে না। আমার স্বামী হুঁশ্চিন্তায় ককালসার হয়ে গেছেন। এবার আমাকে নিকৃতি দাও ঠাকুর, —নিকৃতি দাও।

রমেশ। শৈল!

শৈলজা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বালা জোড়াট হাতে লইয়া উঠিল।

শৈল। তুমি কী সময়ে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে এসেছো?

রমেশ। হ্যাঁ! কিন্তু মামলা লড়ার জন্ত আজ আর সময়ে যাব কিনা ভাবছি। এক তরফা হয়ে যায় বাক। মামলা মোকদ্দমায় আর কাজ নেই শৈল!

শৈল। সে কি! তুমি মিথ্যের বিরুদ্ধে লড়ছো, তুমি যদি মিথ্যেকে মেনে নাও, তাহলে বুঝবো, সত্যের জন্ত লড়াই করার মত তোমার শক্তি নেই বলেই—মিথ্যেকে তুমি মেনে নিচ্ছ।

রমেশ। তা নয় শৈল। এতদিন মেজদার মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করে এসেছি, ছেলের অসুখ, তোমার গয়না, সংসারেও অনটন, কোন দিকেই আমি ভ্রক্ষেপ করিনি। কিন্তু আজ তোমার নিকৃতি পাওয়ার প্রার্থনা আমার মনকে দমিয়ে দিয়েছে। কাজ নেই শৈল। আমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে গাছতলায় থাকব, মোট বয়ে খাবো। তবু জেদ করে আর মামলা লড়ব না।

শৈল। (বালা ছ'গাছি রমেশকে দিয়া) এই শেষ সম্মল দিয়ে, শেষ চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। যাত্রা করে যখন বেরিয়েছো—পেছুলে চলবে না—এই নাও।

এক প্রকার জোর করিয়া বালা ছুঁগাছি রমেশের হাতে দিয়াছি। ইতিমধ্যে হরলাল ব্যস্তমস্তভাবে গিরীশকে সঙ্গে লেইয়া প্রবেশ করিল।

হর। আস্থন, আস্থন বড়বাবু, ছোটবাবু এই ঘরে—

গিরীশকে দেখিয়া শৈলজা বোম্বটা টানিয়া দিল। রমেশ সলজ্জে গিরীশের মুখের পানে একবার চাহিল ও পরে প্রণাম করিল।

গিরীশ। বলি, কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

রমেশ। জেলায়—

গিরীশ। ও! মামলার দিন আছে বুঝি? (রমেশ নিরন্তর) কী? কথা কচ্ছিস্ না যে? জবাব দে—হতভাগা লক্ষীছাড়া, তুমি আমারই খাৎ-পুরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা লড়বে? তোমাকে একসিকি পয়সারও বিষয় দেব না। দূর হ—আমার বাড়ী থেকে এক্ষুণি দূর হ—এক মিনিটও দেবী নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—

শৈলজা দূর হইতে গলায় জ্বাচল দিয়া প্রণাম করিল।

এসো এসো, মা এনো। একি। হাতে কেবল ছুঁগাছা শাঁখা দেখছি! গয়নাগুলো গেল কোথায়? হতভাগা—বৌমাকে তুমি শাঁখা সার করিয়েছো? বল—বৌমার গহনা নিয়ে কী করেছিলি? কোথায় রেখেছিস গহনা?

রমেশ কোন জবাব দিল না। তাহার হাতের বালা ছুঁগাছি দেখিয়া

বৌমার গহনা তোর হাতে কেন? ও বুঝেছি এই সব নিয়ে বুঝি মামলা লড়তে যাচ্ছ? ভাগিয়াস্ বিয়ের ব্যাপারে দেশে এসেছিলাম, তাই তো—নইলে আমার মা লক্ষীকে তো এখানে বসতিস্ হতভাগা শূঁয়ো! সর্ব্ব্বষ বেচে উড়িয়ে দিচ্ছিস্?

গহনা কার ? আমার ! আমি তোমাকে জেলে দিয়ে ছাড়বো
তা জানো।

ইতিমধ্যে কানাই ও পটল আসিয়া গিরীশকে জড়াইয়া ধরিল।

আদর করিয়া পটলকে কোলে তুলিয়া লইয়া

ওরে আমার পটল মাণিক !

একবার পটল একবার কানাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন।

হায়, হায়, হায় ! ছেলেপুলেগুলো না খেতে পেয়ে একেবারে ককাল
সার হয়ে গিয়েছে ! ছেলেপুলেগুলোকে মেয়ে ফেলে তুমি মামলা
চালাচ্ছো ? কবে তোর মামলার দিন আছে ? বল—চূপ করে
রইলি যে—

রমেশ। (সভয়ে) কাল—

গিরীশ। কাল। তবে আজ যাচ্ছিলি কোথায় ? (রমেশ নিরস্তর
বুঝেছি। তদ্বির করার জন্তে ? হ' ! এখনো সময় আছে—তোর
মামলার রায় আমি এফুনি এখানে দিয়ে ~~উ~~ যাবো। হরলাল—
এফুনি একবার বিনোদ ঠাকুরদাকে ডাক ? তাঁর সামনে আমি
সমস্ত বিষয় বোমার নামে দানপত্তর করে দিয়ে তবে যাব।

হর। আমি এফুনি যাচ্ছি বড়বাবু। এফুনি যাচ্ছি— ব্যস্তভাবে প্রস্থান
গিরীশ। বোমা ! তুমি সব গোছগাছ করে নাও মা। বিনোদ
ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, আজ রাতে লেখাপড়াটা সেবে, কাল
সকালে দলীল রেজিষ্ট্রি করে দিয়েই তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবো।
হতভাগা যেতে চায়—যাক, না হয় ওর যা ইচ্ছে তাই করুক,
মোটকথা, তোমাদের আর এখানে এভাবে ফেলে রাখতে পারবো
না। নাও মা, সব গোছগাছ করে রাখ—

পটল গিরীশের চিবুকে হাত দিয়া কহিল।

পটল। আমিও যাব জেঠু—

সিঁদুরী। যাবে, যাবে, তোমরা সবাই যাবে—নইলে তোমার জেঠিমার শূণ্য বিছানা পূর্ণ হবে কি করে? নাও মা! তৈরী হয়ে নাও। একদিন যেমন তোমায় সোনা দিয়ে আশীর্বাদ করে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম—তেমনি আজ আবার ভূমি দান করে আশীর্বাদ করে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। এই যে আমার লক্ষ্মী লাভ মা! লক্ষ্মী লাভ!

পঞ্চম দৃশ্য

গিরীশের কলিকাতার বাড়ী। ড্রইং রুম।

ইরিশ উকিলের সাজসজ্জায় স্তম্ভাশ্রমে বসিয়া আছেন। নরনতারা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে সাধনা দিতেছিলেন।

নরন। পুরুষমানুষ! অতো মুস্‌ড়ে পড়লে কী আর চলে?

ইরিশ। হঁ! আমা... এখনো মাথা ঘুরছে, এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না।

নরন। আমি বলছি এককম করে মনমরা হয়ে না থেকে, আপীল করো—দেখবে, আপীলে আমরা ঠিক জিতবো। মোকদ্দমায় হার জিত তো আছেই।

সিঁদুরীর প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া নরনতারা কহিলেন।

দিদি শুনেছো—আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!

সিঁদে। কী হলো?

নরন। মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে!

সিঁদে। হার হলো!

নরন। এর পরে আমরা সমাজে মুখ দেখাবো কী করে? তোমার

দেওর তো মর্কনাশেছেন। কত কার বলছি—হাইকোর্টে আপীল
করো, হাইকোর্টে হার হয়, আমরা বিলেত পধ্যত যাবো—~~এর জন্তে~~
মন-মরা হয়ে থাকলে চলবে কেন ?

সিন্ধে। আমি বলছি—মের্জাসকনপো। তোমাদের হার হবে না। যত
টাকা লাগে—আমি দেবো। তুমি হাইকোর্ট কর, তুমি জিতবেই—
আমি আশীর্বাদ কবছি।

হারশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সে উপায় আর নেই বোঠান।
সব শেষ হয়ে গিয়েছে। হাইকোর্টই বলো আর বিলেতই বলো,
কোথাও আর বাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই ত দানার নামে পবিত্র
ছিল, বিয়ের নেমস্তম্ব রক্ষা কর্তে দেশে গিয়ে, তিনি সন্ধান
ছোটবোমার নামে দানপত্ৰ করে দিয়ে এসেছেন। দেশের দিকে
মুখ ফেরাবারও আর আমাদের উপায় রইল না।

শিবীল প্রবেশ করিলেন

গিরীশ। এই যে হরিশ, রমেশের ব্যাপার শুনেছো ?

সিন্ধে। ব্যাপার আর কী শুনবে ? তুমি যা সর্কনাশ করেছে। ? ~~হাহাহ~~
আর—

গিরীশ। হুঁ। সর্কনাশ আবার কী কবেছি ?

সিন্ধে। করনি ? দেশের বিষয়-আশয় কেন তুমি ওদেব নামে দানপত্ৰ
করে দিয়ে এলে ?

গিরীশ। কেন দিয়ে এলাম ? দেখতে চাও ? দেখবে তবু ? ছোট
বোমা ! একবার এই দিকে এসো তো মা !

শেলজা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সিন্ধে। এ কি শৈল !

গিরীশ। হ্যা! শুধু মাহুটাকে দেখে যা! তাই অবস্থা হয়েছে—
 তাই ভাল করে দেখ। হতভাগা, বোমার গহনাগুলো সব
 খেয়েছে। আর একটু হলেই বাড়ীর ইট-কাঠগুলো পর্যন্ত খে-
 খেতো। আর ছেলেগুলোর কী অবস্থা হয়েছে, তাই তুমি দেখ
 ওরে পটল, ওরে কানাই, একবার এদিকে আসতো বাবা!

কানাই ও পটল জীর্ণজীর্ণ দেহ লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া
 সিদ্ধেশ্বরী ব্যাকুলভাবে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। কে এদের এই অবস্থা করলে?

গিরীশ। কে আবার? সেই হতভাগাটা! তাই সবদিক বিবেচন,
 করেই তো ভরাডুবি চাটুজ্যে বংশকে মামলার দায় থেকে নিষ্কৃতি
 দিয়ে এলাম বড়বো!

সিদ্ধে। ওগো! তুমি বেশ করেছো। বেশ করেছো। ওঁগো! তুমি
 যে সবাইয়ের চাইতে কত বড়, তা আজ যেমন বুঝলাম, তেমন আর
 কোনদিন বুঝতে পারিনি।

গিরীশ। দেখলে তো বড় বো! আমার সব দিকে নজর থাকে কী
 না? কালকের ছোঁড়া রমেশ, সে কিনা আমার চোখে ধুলো দিয়ে—
 আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে? তাই আমি এত
 কায়দায় বেঁধে দিয়ে এলাম বড়বো! যে সেখানে আর
 বাচাধনের চালাকীটি চলবে না—চালাকীটি চলবে না—

গিরীশের কথার মাঝে ধীরে ধীরে বনিকা নানিতে থাকে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এম. এ. সন-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রী: গোবিন্দগদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

